লঘুগুরু

প্রবন্ধাবলী

রাজশেখর বসু

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সূচী

নামতত্ত্ব

(১৩৩০)

হরিনাম নয়, সাধারণ বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোকের নামের কথা বলিতেছি।

কবি যাহাই বলুন, নাম নিতান্ত তুচ্ছ জিনিস নয়। পুত্রকন্যার নামকরণের সময় অনেকেই মাথা ঘামাইয়া থাকেন। অতএব নাম লইয়া একটু আলোচনা করা নিরর্থক হইবে না।

প্রথম প্রশ্ন—বাঙালীর সংক্ষিপ্ত নাম কিরকম হওয়া উচিত। মিস্টার ব্রাউনের নকলে মিস্টার ব্যানার্জি চলিয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক হাজার আছেন। এত বড় গোষ্ঠীর প্রত্যেকে যদি মিস্টার ব্যানার্জি হইতে চান তবে লোক চেনা মুশকিল। বিলাতী প্রথার অন্ধ অনুকরণে এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। পাড়াগাঁয়ে বা অন্তরঙ্গগণের মধ্যে বাঁড়ুজ্যে মশায় চলিতে পারে, কারণ সংকীর্ণ ক্ষেত্রে লোক চেনা সহজ। কিন্তু সর্বসাধারণের কাছে বাঁড়ুজ্যে বলিলে ব্যক্তিবিশেষ বোঝায় না। সুরেন্দ্রবাবু বরং ভাল। সুরেন্দ্রের সংখ্যা অনেক হইলেও বোধ হয় বাঁড়ুজ্যের সংখ্যা অপেক্ষা কম। যদি নামের বিশেষ করা বাঞ্ছনীয় হয় তবে নামকরণের

সময় সুরেন্দ্রের পরিবর্তে অন্য কোনও অসাধারণ নাম রাখা যাইতে পারে। কিন্তু বৈশিষ্ট্যের জন্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেশী রকম রূপান্তরিত করা অসম্ভব। বাঁড়ুজ্যে, ব্যানার্জি, বনারজি—বড় জোর বানরজি। সুরেন্দ্র-বাবুতে অরুচি হইলে মিস্টার সুরেন্দ্র বা শ্রীযুত সুরেন্দ্র বা সুরেন্দ্রজী চলিতে পারে। কেউ হয়তো বলিবেন—বাপের নাম মিস্টার সুরেন্দ্র আর ছেলের নাম মিস্টার রমেশ, ইহা বড় বিসদৃশ; মিস্টার ব্রাউনের পুত্র মিস্টার ব্ল্যাক—এরকম বিলাতী নজির নাই। বাপের নাম বজায় রাখার উদ্দেশ্য সাধু; কিন্তু তাহা অন্য উপায়েও হইতে পারে। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ প্রভৃতি দেশে পুত্রের নামের সঙ্গে পিতার নাম যোগ করার রীতি আছে। বংশগত পদবীটা ছাড়িতে বলিতেছি না, পুরা নাম বলিবার সময় ব্যবহার করিতে পারেন। মিস্টার সুরেন্দ্র যদি স্বনামে জগদ্‌বিখ্যাত হন তবে বংশপরিচয় না দিলেও চলিবে। কালিদাস পাড়ে ছিলেন কি চৌবে ছিলেন, সক্রেটিস কোন্ কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন তাহা এখনও জানা যায় নাই, কিন্তু সেজন্য কোনও ক্ষতি হয় নাই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—নাম শ্রীযুক্ত না শ্রীহীন হইবে। এই জটিল বিষয় লইয়া অনেক গবেষণা হইয়া গিয়াছে। শ্রী-বিরোধী বলেন—শ্রী অর্থে ভাগ্যবান, নিজের নামে যোগ করিলে সৌভাগ্যগর্ব প্রকাশ পায়; আর অক্ষরটিও নিষ্প্রয়োজন বোঝা মাত্র। শ্রীর আদিম অর্থ যাহাই হউক সাধারণে এখন গতানুগতিক ভাবেই ব্যবহার করে, অতএব গর্বের অপবাদ নিতান্ত ভিত্তিহীন। যিনি অনাবশ্যক বোধে ভার কমাইতে চান তিনি শ্রী বর্জন করিতে পারেন। তবে অনেকে যেসব ভারী ভারী বোঝা নামের সঙ্গে যোগ করিবার জন্য লালায়িত তাহার তুলনায় শ্রীঅক্ষরটি নগণ্য।

তাহার পর সমস্যা নামের গঠন লইয়া। বাঙালী পুরুষের নাম

প্রায় দুই শব্দ বিশিষ্ট, যথা—নরেন্দ্র-নাথ, নরেন্দ্র-কৃষ্ণ। দুই শব্দ কি সমাসবদ্ধ না পৃথক্‌? ষষ্ঠী তৎপুরুষে নরেন্দ্রনাথ নিষ্পন্ন হইতে পারে, অর্থাৎ রাজার রাজা। রাজেন্দ্রনাথও তদ্রূপ, অর্থাৎ রাজার রাজা তস্য রাজা। নরেন্দ্রকৃষ্ণ বোধ হয় দ্বন্দ্ব সমাস, অর্থাৎ ইনি নরেন্দ্রও বটেন কৃষ্ণও বটেন। নরেন্দ্রলাল সংস্কৃত-ফারসীর খিচুড়ি, ভাবার্থ বোধ হয় নরেন্দ্র নামক দুলাল। নিবারণচন্দ্র বোঝা যায় না, হয়তো আন্নাকালীর পুংসংস্করণ। মোট কথা, লোকে ব্যাকরণ অভিধান দেখিয়া নাম রাখে না, শুনিতে ভাল হইলেই হইল। রাজা-মহারাজেরা গালভরা নাম চান, যথা জগদিন্দ্রনারায়ণ, ক্ষৌণীশচন্দ্র। কিন্তু তাঁহারা বিলাতী অভিজাতবর্গের তুলনায় অনেক অল্পে তুষ্ট। George Fitzpatrick Fitzgerald Marmaduke Baron Figgins—এরকম নাম এখনও এদেশে চলে নাই। উড়িষ্যায় আছে বটে—শ্রীনন্দনন্দন হরিচন্দন ভ্রমরবর রায়। সুখের বিষয় আজকাল অনেক বাঙালী ছোটখাটো নাম পছন্দ করিতেছেন।

বাঙালী বিদ্যাভিমানী শৌখিন জাতি। শরীরে আর্যরক্তের যতই অভাব থাকুক, বিশুদ্ধ সংস্কৃতমূলক নাম বাঙালীর যত আছে অন্য জাতির বোধ হয় তত নাই। তথাপি অর্থবিভ্রাট অনেক দেখা যায়। মন্মথর পুত্র সন্মথ, শ্রীপতির পুত্র সাতকড়িপতি, তারাপদর ভাই হীরাপদ, রাজকৃষ্ণর ভাই ধিরাজকৃষ্ণ দুর্লভ নয়।

আর এক ভাবিবার বিষয়—নামের ব্যঞ্জনা বা connotation। যেসকল নাম অনেক দিন হইতে চলিতেছে তাহা শুনিলে মনে কোনও রূপ ভাবের উদ্রেক হয় না। নরেন্দ্রনাথ বা এককড়ি শুনিলে মনে আসে না নামধারী বড়লোক বা কাঙাল। রমণীমোহন সুপ্রচলিত সেজন্য

অতি নিরীহ, কিন্তু মহিলামোহন শুনিলে lady killer মনে আসে। অনিলকুমার নাম বোধ হয় রামায়ণে নাই, সেজন্য ইহা এখন শৌখিন নাম রূপে গণ্য হইয়াছে কিন্তু পবননন্দন নাম হইলে ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো দুরূহ। কালীদাসী সেকেলে হইলেও অচল নয়, কিন্তু কালীনন্দিনীর বিবাহের আশা কম, নাম শুনিলেই মনে আসিবে রক্ষাকালীর বাচ্চা। অতএব নামকরণের সময় ভাবার্থের উপর একটু দৃষ্টি রাখা ভাল। আজকাল পুরুষের মোলায়েম নাম অতিমাত্রায় চলিতেছে। রমণী, কামিনী, সরোজ, শিশির, নলিনী, অমিয় ইত্যাদি নাম পুরুষরা অনেক দিন হইতে বেদখল করিয়াছেন, এখন আবার কুসুম, মৃণাল, জ্যোৎস্না লইয়া টানাটানি করিতেছেন। চলন হইয়া গেলে অবশ্য সকল নামেরই ব্যঞ্জনা লোপ পায় কিন্তু কোমল নারীজনোচিত নামের বাহুল্য দেখিয়া বোধ হয় বাঙালী পিতামাতা পুত্র-সন্তানকে কমলবিলাসী সুকুমার করিতে চান।

পুরুষের নাম একটু জবরদস্ত হইলেই ভাল হয়। ঘটোৎকচ বা খড়্গেশ্বর নাম রাখিতে বলি না, কিন্তু যাহা আমরণ নানা অবস্থায় ব্যবহার করিতে হইবে তাহা একটু টেকসই গরদখোর হওয়া দরকার। উপন্যাসের নায়ক তরুণকুমার হইতে পারেন, কারণ কাহিনী শেষ হইলে তাঁহার বয়স আর বাড়িবে না। কিন্তু জীবন্ত তরুণকুমারের বয়স বাড়িয়া গেলে নামটা আর খাপ খায় না। বালকের নাম চঞ্চলকুমার হইলে বেমানান হয় না, কিন্তু উক্ত নামধারী যদি চল্লিশ পার হইয়া মোটা থপথপে হইয়া পড়েন তবে চিন্তার কথা। জ্যোৎস্নাকুমার কবি বা গায়ক হইলে মানায়, কিন্তু চামড়ার দালালি বা পুলিস কোর্টে ওকালতি তাঁহার সাজে না।

মেয়েদের বেলা বোধ হয় এতটা ভাবিবার দরকার নাই। তাঁহারা সুরূপা, কুরূপা, বালিকা, বৃদ্ধা যাহাই হউন, নামটা তাঁহাদের অঙ্গের অলংকার বা বেনারসী শাড়ির মতই সর্বাবস্থায় সহনীয়।

কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে আর এক দিক হইতে কিছু ভাবিবার আছে। কিছুকাল পূর্বে এক মাসিক পত্রিকায় প্রশ্ন উঠিয়াছিল—মেমেদের যেমন নামের আগে মিস বা মিসিস যোগ হয় বাঙালী মহিলার নামে সেরূপ কিছু হইবে কিনা। অবিবাহিতা বাঙালী মেয়ের নামের আগে আজকাল কুমারী লেখা হয়, কিন্তু বিবাহিতার বিশেষণ দেখা যায় না। ভারতের কয়েকটি প্রদেশে সধবাসূচক শ্রীমতি বা সৌভাগ্যবতী চলিতেছে। জিজ্ঞাসা করি — কুমারী বা সধবা বা বিধবা সূচক বিশেষণের কিছুমাত্র দরকার আছে কি? পুরুষের বেলা তো না হইলেও চলে। স্ত্রীজাতি কি নিলামের মাল যে নামের সঙ্গে for sale অথবা sold টিকিট মারা থাকিবে? বিলাতী প্রথার কারণ বোধ হয় এই যে বিলাতী সমাজে নারীর উপযাচিকা হইয়া পতিপ্রার্থনা করিবার রীতি এখনও তেমন চলে নাই, সেজন্য পুরুষ বিবাহিত কিনা তাহা নারীর না জানিলেও চলে। কিন্তু বিবাহার্থী পুরুষ আগেই জানিতে চায় নারী অনূঢ়া কিনা। এদেশে অধিকাংশ বিবাহই ভালরকম খোঁজখবর লইয়া সম্পাদিত হয়, সেজন্য নারীর নামে মার্কা দেওয়া নিতান্ত অনাবশ্যক।

পরিশেষে আর একটি কথা নিবেদন করি। বাঙালী মহিলা দ্বিজবর্ণা হইলে নামান্তে দেবী লেখেন। যাঁহারা দ্বিজা নহেন তাঁহারা সেকালে দাসী লিখিতেন, এখন স্বামীর পদবী বা অনূঢ়া হইলে পিতৃপদবী লেখেন। যাঁহারা দ্বিজাতির দেবত্বের দাবি করেন তাঁহারা দেবী লিখুন, কিছু বলিবার নাই। কিন্তু যেসকল মহিলা বংশগত শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করেন না তাঁহারা

কেন নামের শেষে দেবী লিখিয়া বিজেতরা নারী হইতে পৃথক গণ্ডিতে থাকিবেন? অবশ্য নারী মাত্রেই যদি দেবী হন তবে আপত্তির কারণ নাই, বরং একটা সুবিধা হইতে পারে। অনাত্মীয়া অথচ সুপরিচিতা মহিলাকে মাসী পিসী দিদি বউদিদি বলিয়া অথবা নাম ধরিয়া ডাকা চলে। কিন্তু অল্পপরিচিতার সঙ্গে হঠাৎ সম্বন্ধে পাতানো যায় না, কেবল নাম ধরিয়া ডাকাও বেয়াদবি। যদি নামের সঙ্গে দেবী যোগ করিয়া ডাকার প্রচলন হয় তবে বাংলা কথাবার্তায় শ্রুতিকটু মিস আর মিসিস বাদ দেওয়া চলে। কুমারী বা বিবাহিতা, তরুণী বা বৃদ্ধা যাহাই হউন, 'শুনছেন অমুকা দেবী' বলিয়া ডাকিলে দোষ কি?

ডাক্তারি ও কবিরাজি

(১৩৩১)

আমি চিকিৎসক নহি, তথাপি আমার তুল্য অব্যবসায়ীর চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার আছে। আমার এবং আমার উপর যাঁহারা নির্ভর করেন তাঁহাদের মাঝে মাঝে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, এবং সেই চিকিৎসা কি পদ্ধতিতে করা হইবে তাহা আমাকেই স্থির করিতে হয়। অ্যালোপাথি, হোমিওপাথি, কবিরাজি, হাকিমি, পেটেণ্ট, স্বস্ত্যয়ন, মাতুলি, আরও কত কি — এইসকল নানা পন্থা হইতে একটি বা ততোধিক আমাকে বাছিয়া লইতে হয়। শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের উপদেশে বিশেষ সুবিধা হয় না, কারণ তাঁহাদের অভিজ্ঞতা আমারই তুল্য। আর, যদি কেহ চিকিৎসক বন্ধু থাকেন, তাঁহার মত একবারেই অগ্রাহ্য, কারণ তিনি আপন পদ্ধতিতে অন্ধবিশ্বাসী। অগত্যা জীবনমরণ সংক্রান্ত এই বিষম দায়িত্ব আমারই উপর পড়ে।

শুনিতে পাই চিকিৎসাবিদ্যা একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। বিজ্ঞানের নামে আমরা একটু অভিভূত হইয়া পড়ি। ডাক্তার, কবিরাজ, মাতুলি-বিশারদ সকলেই বিজ্ঞানের দোহাই দেন। কাহার শরণাপন্ন হইব? সাধারণ বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে এত গণ্ডগোল নাই। ভূগোলে পড়িয়াছিলাম পৃথিবী গোল। সব প্রমাণ মনে নাই, মনে থাকিলেও পরীক্ষার প্রবৃত্তি নাই। সকলেই বলে পৃথিবী গোল, অতএব আমিও তাহা বিশ্বাস করি। যদি ভবিষ্যতে পৃথিবী ত্রিকোণ বলিয়া সাব্যস্ত হয় তবে আমার ও আমার

আত্মীয়বর্গের মত বদলাইতে দেরি হইবে না। কিন্তু চিকিৎসাতত্ত্ব সম্বন্ধে লোকে একমত নয়, সে জন্য সকলেই একটা গতানুগতিক বাঁধা রাস্তায় চলিতে চায় না।

সর্বাবস্থায় সকল রোগীকে নিরাময় করার ক্ষমতা কোনও পদ্ধতির নাই, আবার অনেক রোগ আপনাআপনি সারে অথচ চিকিৎসার কাকতালীয় খ্যাতি হয়। অতএব অবস্থাবিশেষে বিভিন্ন লোক আপন বুদ্ধি ও সুবিধা অনুসারে বিভিন্ন চিকিৎসার শরণ লইবে ইহা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু চিকিৎসা নির্বাচনে এত মতভেদ থাকিলেও দেখা যায় যে, কেবল কয়েকটি পদ্ধতির প্রতিই লোকের সমধিক অনুরাগ। ব্যক্তিগত জনমত যতটা অব্যবস্থ, জনমতসমষ্টি তত নয়। ডাক্তারি (অ্যালোপাথি), হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজি বাংলা দেশে যতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহার তুলনায় অন্যান্য পদ্ধতি বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

যাঁহারা ক্ষমতাপন্ন তাঁহারা নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু সকলের সামর্থ্যে তাহা কুলায় না, সরকার বা জনসাধারণের আনুকূল্যের উপর আমাদের অনেককেই নির্ভর করিতে হয়। যে পদ্ধতি সরকারী সাহায্যে পুষ্ট তাহাই সাধারণের সহজলভ্য। যদি রাজমত বা জনমত বহু পদ্ধতির অনুরাগী হয় তবে অর্থ ও উদ্যমের সংহতি খর্ব হয়, জনচিকিৎসার কোনও সুব্যবস্থিত প্রতিষ্ঠান সহজে গড়িয়া উঠিতে পারে না। অতএব উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন যেমন বাঞ্ছনীয়, মতৈক্য তেমনই বাঞ্ছনীয়।

দেশের কর্তা ইংরেজ, সেজন্য বিলাতে যে চিকিৎসাপদ্ধতি প্রচলিত আছে এদেশে তাহাই সরকারী সাহায্যে পুষ্ট হইতেছে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে কবিরাজির সপক্ষে আন্দোলন চলিতেছে যে এই সুলভ সুপ্রতিষ্ঠ

চিকিৎসাপদ্ধতিকে সাহায্য করা সরকারের অবশ্যকর্তব্য। হোমিওপাথিরও বহু ভক্ত আছে, তথাপি তাহার পক্ষে এমন আন্দোলন হয় নাই। কারণ বোধ হয় এই — হোমিওপাথি সর্বাপেক্ষা অল্পব্যয়সাপেক্ষ, সেজন্য কাহারও মুখাপেক্ষী নয়। সরকারী সাহায্যের বখরা লইয়া যে দুটি পদ্ধতিতে এখন দ্বন্দ্ব চলিতেছে, অর্থাৎ সাধারণ ডাক্তারি ও কবিরাজি, তাহাদের সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। হাকিমি-চিকিৎসা ভারতের অন্যত্র কবিরাজির তুল্যই জনপ্রিয়, কিন্তু বাংলা দেশে তেমন প্রচলিত নয় সেজন্য তাহার আলোচনা করিব না। তবে কবিরাজি সম্বন্ধে যাহা বলিব হাকিমি সম্বন্ধেও তাহা মোটামুটি প্রয়োজ্য।

যাঁহারা প্রাচ্য পদ্ধতির ভক্ত তাহাদের সনির্বন্ধ আন্দোলনে সরকার একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিয়াছেন — বেশ তো, একটা কমিটি করিলাম, ইহারা বলুন প্রাচ্য পদ্ধতি সাহায্যলাভের যোগ্য কিনা, তাহার পর যাহা হয় করা যাইবে। এই কমিটি দেশী বিলাতী অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির মত লইয়াছেন। এযাবৎ যাহা লইয়া মতভেদ হইয়া আসিতেছে তাহা সাধারণের অবোধ্য নয়। সরকারী অর্থসাহায্য যাহাকেই দেওয়া হউক তাহা সাধারণেরই অর্থ, অতএব সর্বসাধারণের এ বিষয়ে উদাসীন থাকা অকর্তব্য। অর্থ ও উদ্যম যাহাতে যোগ্য পাত্রে যোগ্য উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় তাহা সকলেরই দেখা উচিত।

প্রাচ্য পদ্ধতির বিরোধীরা বলেন — তোমাদের শাস্ত্র অবৈজ্ঞানিক। বাত পিত্ত কফ, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না, এসকল কেবল হিং টিং ছট। তোমাদের ঔষধে কিছু কিছু ভাল উপাদান আছে স্বীকার করি, কিন্তু তাহার সঙ্গে বিস্তর বাজে জিনিস মিশাইয়া অনর্থক আড়ম্বর করা হইয়াছে। তোমাদের ঋষিরা প্রাচীন আমলের হিসাবে খুব জ্ঞানী ছিলেন বটে, কিন্তু

তোমরা কেবল অন্ধভাবে সেকালের অনুসরণ করিতেছে, আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে পার নাই। তোমরা ভাব যাহা শাস্ত্রে আছে তাহাই চূড়ান্ত, তাহার পর আর কিছু করিবার নাই — অথচ তোমরা আয়ুর্বেদবর্ণিত শস্ত্রচিকিৎসার মাথা খাইয়াছ। চিকিৎসায় পারদর্শী হইতে গেলে যেসব বিদ্যা জানা দরকার, যথা আধুনিক শারীরবৃত্ত, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন, জীবাণুবিদ্যা ইত্যাদি, তাহার কিছুই জান না। মুখে যতই আস্ফালন কর ভিতরে ভিতরে তোমাদের আত্মনির্ভরতায় শোষ ধরিয়াছে, তাই লুকাইয়া কুইনীন চালাও। তোমাদের সাহায্য করিলে কেবল কুসংস্কার ও ভণ্ডামির প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। এইবার আমাদের কথা শোন।—আমরা কোনও প্রাচীন যোগী-ঋষির উপর নির্ভর করি না। হিপোক্রাটিস গালেন প্রভৃতির আমরা অন্ধ শিষ্য নহি। আমাদের বিদ্যা নিত্য উন্নতিশীল। পূর্বসংস্কার যখনই ভুল বলিয়া জানিতে পারি তখনই তাহা অম্লানবদনে স্বীকার করি। বিজ্ঞানের যে কোনও আবিষ্কারের সাহায্য লইতে আমাদের দ্বিধা নাই। ক্রমাগত পরীক্ষা করিয়া নব নব ঔষধ ও চিকিৎসাপ্রণালী আবিষ্কার করি। আমাদের কেহ কেহ মকরধ্বজ ব্যবস্থা করেন বটে, কিন্তু গোপনে নয় প্রকাশ্যে। আমাদের কুসংস্কার ও কূপমণ্ডুকতা নাই।

অপর পক্ষ বলেন — আচ্ছা বাপু, তোমাদের বিজ্ঞান আমরা জানি না, মানিলাম। কি আমাদের এই যে বিশাল আয়ুর্বেদশাস্ত্র, তোমরা কি তাহা অধ্যয়ন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছ? বাত, পিত্ত, কফ না বুঝিয়াই ঠাট্টা কর কেন? আমাদের অবনতি হইয়াছে স্বীকার করি, এখন আর আমাদের মধ্যে নূতন ঋষি জন্মেন না। অগত্যা যদি আমরা পুরাতন ঋষির উপদেশেই চলি, সেটা কি মন্দের ভাল নয়? তোমাদের

পদ্ধতিতে অনেক খরচ। তোমাদের স্কুলে একটা হাতুড়ে ডাক্তার উৎপন্ন করিতে যত টাকা পড়ে, তাহার সিকির সিকিতে আমাদের বড় বড় মহামহোপাধ্যায় গুরুগৃহে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। তোমাদের ঔষধ পথ্য সরঞ্জাম সমস্তই মহার্ঘ, বিদেশের উপর নির্ভর না করিলে চলে না। বিজ্ঞানের অজুহাতে তোমরা চিকিৎসায় বিলাতী কুসংস্কার ও বিলাসিতা আমদানি করিয়াছ। আমাদের ঔষধপথ্য সমস্তই সস্তা, এদেশেই পাওয়া যায়, গরিবের উপযুক্ত। আমাদের ঔষধে যতই বাজে জিনিস থাক, স্পষ্ট দেখিতেছি উপকার হইতেছে। তোমাদের অনেক ঔষধে কোহল আছে। বিলাতী উদরে হয়তো তাহা সমুদ্রে জলবিন্দু, কিন্তু আমাদের অনভ্যস্ত জঠরে সেই অপেয় অদেয় অগ্রাহ্য জিনিস ঢালিবে কেন? আমাদের দেশবাসীর ধাতু তোমাদের বিলাতী গুরুগণ কি করিয়া বুঝিবেন? তোমাদের চিকিৎসা যতই ভাল হউক, এই দরিদ্র দেশের কয়জনের ভাগ্যে তাহা জুটিবে? যাঁহাদের সামর্থ্য আছে তাঁহারা ডাক্তারী চিকিৎসা করান, কিন্তু গরিবের ব্যবস্থা আমাদের হাতে দাও। বড় বড় ডাক্তার যাহাকে জবাব দিয়াছে এমন রোগীকেও আমরা সারাইয়াছি, বিদ্বান সম্ভ্রান্ত লোকেও আমাদের ডাকে, আমরাও মোটর চালাই। কেবল কুসংস্কারের ভিত্তিতে কি এতটা প্রতিপত্তি হয়? মোট কথা — তোমাদের বিজ্ঞান এক পথে গিয়াছে, আমাদের বিজ্ঞান অন্য পথে গিয়াছে। কিছু তোমরা জান, কিছু আমরা জানি। অতএব চিকিৎসা বাবদ বরাদ্দ টাকার কিছু তোমরা লও, কিছু আমরা লই।

আমার মনে হয় এই দ্বন্দ্বের মূলে আছে 'বিজ্ঞান' শব্দের অসংযত প্রয়োগ এবং 'চিকিৎসাবিজ্ঞান' ও 'চিকিৎসাপদ্ধতি'র অর্থবিপর্যয়। Eastern science, eastern system, western science, western

system — এসকল কথা প্রায়ই শোনা যায়। কথাগুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া দেখা ভাল।

'বিজ্ঞান' শব্দে যদি পরীক্ষা প্রমাণ যুক্তি ইত্যাদি দ্বারা নির্ণীত শৃঙ্খলিত জ্ঞান বুঝায় তবে তাহা দেশে দেশে পৃথক হইতে পারে না। যে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত জগতের গুণিসভার বিচারে উত্তীর্ণ হয় তাহাই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অবশ্য মানুষের দৃষ্টি সংকীর্ণ, সে জন্য কালে কালে সিদ্ধান্তের অল্পাধিক পরিবর্তন হইতে পারে। যাঁহারা বলেন — পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান মানি না, অপৌরুষেয় অথবা দিব্যদৃষ্টিলব্ধ সনাতন সিদ্ধান্তই আমাদের নির্বিচারে গ্রহণীয় — তাঁহাদের সহিত তর্ক চলে না।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিজ্ঞানের এমন অর্থ হইতে পারে না যে একই সিদ্ধান্ত কোথাও সত্য কোথাও মিথ্যা। কুতার্কিক বলিতে পারে— শ্রাবণ মাসে বর্ষা হয় ইহা এদেশে সত্য বিলাতে মিথ্যা; মশায় ম্যালেরিয়া আনে ইহা এক জেলায় সত্য অন্য জেলায় মিথ্যা। এরূপ হেত্বাভাস খণ্ডনের আবশ্যকতা নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিজ্ঞানের একমাত্র অর্থ— বিভিন্ন দেশে আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত যাহা সর্বদেশেই মান্য।

বিজ্ঞান কেবল বিজ্ঞানীর সম্পত্তি নয়। সাধারণ লোক আর বিজ্ঞানীর এইমাত্র প্রভেদ যে বিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত অধিকতর সূক্ষ্ম শৃঙ্খলিত ও ব্যাপক। আমরা সকলেই বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করি। অগ্নিপক্ব দ্রব্য সহজে পরিপাক হয় এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া রন্ধন করি, দেহ-আবরণে শীতনিবারণ হয় এই তথ্য জানিয়া বস্ত্রধারণ করি। কতক সংস্কারবশে করি, কতক দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া করি। অসত্য সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াও অনেক কাজ করি বটে

কিন্তু জীবনের যাহা কিছু সফলতা তাহা সত্য সিদ্ধান্ত দ্বারাই লাভ করি। চরক বলিয়াছেন—

সমগ্রং দুঃখমায়াতমবিজ্ঞানে দ্বয়াশ্রয়ং।
সুখং সমগ্রং বিজ্ঞানে বিমলে চ প্রতিষ্ঠিতম্॥

অর্থাৎ শারীরিক মানসিক সমগ্র দুঃখ অবিজ্ঞানজনিত। সমগ্র সুখ বিমল বিজ্ঞানেই প্রতিষ্ঠিত।

গাড়িতে চাকা লাগাইলে সহজে চলে এই সিদ্ধান্ত কোন্ দেশে কোন্ যুগে কোন্ মহাবিজ্ঞানী কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল জানা যায় নাই, কিন্তু সমস্ত জগৎ বিনা তর্কে ইহার সৎপ্রয়োগ করিতেছে। চশমা ক্ষীণ দৃষ্টির সহায়তা করে এই সত্য পাশ্চাত্ত্য দেশে আবিষ্কৃত হইলেও এদেশের লোক তাহা মানিয়া লইয়াছে। বিজ্ঞান বা সত্য সিদ্ধান্তের উৎপত্তি যেখানেই হউক, তাহার জাতিদোষ থাকিতে পারে না, বয়কট চলিতে পারে না।

কিন্তু কি করিয়া বুঝিব অমুক সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক কি না? বিজ্ঞানীদের মধ্যেও মতভেদ হয়। আজ যাহা অভ্রান্ত গণ্য হইয়াছে ভবিষ্যতে হয়তো তাহাতে ত্রুটি বাহির হইবে অতএব সিদ্ধান্তেরও মর্যাদাভেদ আছে। মোটামুটি সকল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে এই দুই শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে—

১। যাহার পরীক্ষা সাধ্য এবং বার বার হইয়াছে।

২। যাহার চূড়ান্ত পরীক্ষা হইতে পারে নাই অথবা হওয়া অসম্ভব, কিন্তু যাহা অনুমানসিদ্ধ এবং যাহার সহিত কোনও সুপরীক্ষিত সিদ্ধান্তের বিরোধ এখন পর্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই।

বলাবাহুল্য, প্রথম শ্রেণীর সিদ্ধান্তেরই ব্যাবহারিক মূল্য অধিক। এই দুই শ্রেণীর অতিরিক্ত আরও নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত প্রচলিত আছে যাহা

এখনও অপরীক্ষিত অথবা কেবল লোকপ্রসিদ্ধি বা ব্যক্তিবিশেষের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এপ্রকার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া আমরা অনেক কাজ করিয়া থাকি, কিন্তু এগুলিকে বিজ্ঞানের শ্রেণীতে ফেলা অনুচিত।

চিকিৎসা একটি ব্যাবহারিক বিদ্যা। ইহার প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞানের সহায়তা লইতে হয়। কিন্তু এই সমস্ত বিজ্ঞানের সকলগুলি সমান উন্নত নয়। কৃত্রিম যন্ত্রের কার্যকারিতা অথবা এক দ্রব্যের উপর অপর দ্রব্যের ক্রিয়া সম্বন্ধে যত সহজে পরীক্ষা চলে এবং পরীক্ষার ফল যেপ্রকার নিশ্চয়ের সহিত জানা যায়, জটিল মানবদেহের উপর সেপ্রকার সুনিশ্চিত পরীক্ষা সাধ্য নয়। অতএব চিকিৎসাবিদ্যায় সংশয় ও অনিশ্চয় অনিবার্য। পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর চিকিৎসাবিদ্যা যতটা নির্ভর করে, অল্পপরীক্ষিত অপরীক্ষিত কিংবদন্তীমূলক ও ব্যক্তিগত মতের উপর ততোধিক নির্ভর করে। কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য সকল চিকিৎসাপদ্ধতি সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। অতএব বর্তমান অবস্থায় সমগ্র চিকিৎসাবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা অত্যুক্তি মাত্র, এবং তাহাতে সাধারণের বিচারশক্তিকে বিভ্রান্ত করা হয়।

কবিরাজগণ মনে করেন তাঁহাদের চিকিৎসাপদ্ধতি একটা স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ বিজ্ঞান, অতএব ডাক্তারী বিদ্যার সহিত তাহার সম্পর্ক রাখা নিষ্প্রয়োজন। চিকিৎসাবিদ্যার যে অংশ বিজ্ঞানের অতিরিক্ত তাহা লইয়া মতভেদ চলিতে পারে, কিন্তু যাহা বিজ্ঞানসম্মত এবং প্রমাণ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত তাহা বর্জন করা আত্মবঞ্চনা মাত্র। অমুক তথ্য বিলাতে আবিষ্কৃত হইয়াছে অতএব তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ নাই — কবিরাজগণের এই ধারণা যদি পরিবর্তিত না হয় তবে তাঁহাদের অবনতি অনিবার্য।

এমন দিন ছিল যখন দেশের লোকে সকল রোগেই তাঁহাদের শরণ লইত। কিন্তু আজকাল যাঁহারা কবিরাজির অতিশয় ভক্ত তাঁহারাও মনে করেন কেবল বিশেষ বিশেষ রোগেই কবিরাজি ভাল। নিত্য উন্নতিশীল পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতির প্রভাবে কবিরাজী চিকিৎসার এই সংকীর্ণ সীমা ক্রমশ সংকীর্ণতর হইবে। পক্ষান্তরে যাঁহারা কেবল পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিরই চর্চা করিয়াছেন তাঁহাদেরও আয়ুর্বেদের প্রতি অবজ্ঞা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। নবলব্ধ বিদ্যার অভিমানে হয়তো তাঁহারা অনেক পুরাতন সত্য হারাইতেছেন। এইসকল সত্যের সন্ধান করা তাঁহাদের অবশ্যকর্তব্য। চরকের এই মহাবাক্য সকলেরই প্রণিধানযোগ্য—

নচৈব হি সুতরাং আয়ুর্বেদস্য পারং। তস্মাৎ
অপ্রমত্তঃ শশ্বৎ অভিযোগমস্মিন্ গচ্ছেৎ। ...
কৃৎস্নোহি লোকে বুদ্ধিমতাং আচার্যঃ, শত্রুশ্চ
অবুদ্ধিমতাম্। এতচ্চ অভিসমীক্ষ্য বুদ্ধিমতা
অমিত্রস্যাপি ধন্যং যশস্যং আয়ুষ্যং লোকহিতকরং
ইতি উপদিশতো বচঃ শ্রোতব্যং অনুবিধাতব্যঞ্চ।

অর্থাৎ — সুতরাং আয়ুর্বেদের শেষ নাই। অতএব অপ্রমত্ত হইয়া সর্বদা ইহাতে অভিনিবেশ করিবে।... বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সকলকেই গুরু মনে করেন, কিন্তু অবুদ্ধিমান সকলকেই শত্রু ভাবেন। ইহা বুঝিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধনকর যশস্কর আয়ুষ্কর ও লোকহিতকর উপদেশবাক্য অমিত্রের নিকটেও শুনিবেন এবং অনুসরণ করিবেন।

কেহ কেহ বলিবেন, কবিরাজগণ যদি ডাক্তারী শাস্ত্র হইতে কিছু গ্রহণ করেন তবে তাঁহারা ভক্তগণের শ্রদ্ধা হারাইবেন — যদিও সেসকল ভক্ত আবশ্যকমত ডাক্তারী চিকিৎসাও করান। এ আশঙ্কা হয়তো

সত্য। এমন লোক অনেক আছে যাহারা নিত্য আশাস্ত্রীয় আচরণ করে কিন্তু ধর্মকর্মের সময় পুরোহিতের নিষ্ঠার ত্রুটি সহিতে পারে না। সাধারণের এইপ্রকার অসমঞ্জস গোঁড়ামির জন্য কবিরাজগণ অনেকটা দায়ী। তাঁহারা এযাবৎ প্রাচীনকে অপরিবর্তনীয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন; সাধারণেও তাহাই শিখিয়াছে। তাঁহারা যদি বিজ্ঞাপনের ভাষা অন্যবিধ করেন এবং ত্রিকালজ্ঞ ঋষির সাক্ষ্য একটু কমাইয়া বর্তমানকালোচিত যুক্তি প্রয়োগ করেন তবে লোকমতের সংস্কারও অচিরে হইবে।

শাস্ত্র ও ব্যবহার এক জিনিস নয়। হিন্দুর শাস্ত্র যাহা ছিল তাহাই আছে, কিন্তু ব্যবহার যুগে যুগে পরিবর্তিত হইতেছে। অথচ সেকালেও হিন্দু ছিল, একালেও আছে। প্রাচীন চিন্তাধারার ইতিহাস এবং প্রাচীন জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসাবে শাস্ত্র অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সযত্ন অধ্যয়নের বিষয়, কিন্তু কোনও শাস্ত্র চিরকালের উপযোগী ব্যাবহারিক পন্থা নির্দেশ করিতে পারে না। চরক-সুশ্রুতের যুগে অজ্ঞাত অনেক ঔষধ ও প্রণালী রসরত্নাকর ভাবপ্রকাশ প্রভৃতির যুগে প্রবর্তিত হইয়াছিল। কোনও একটি বিশেষ যুগ পর্যন্ত যেসকল আবিষ্কার বা উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহাই আয়ুর্বেদের অন্তর্গত, তাহার পরে আর উন্নতি হইতে পারে না — এরূপ ধারণা অধোগতির লক্ষণ। নূতন জ্ঞান আত্মসাৎ করিলেই আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতির জাতিনাশ হইবে না। বিজ্ঞান ও পদ্ধতি এক নয়। বিজ্ঞান সর্বত্র সমান, কিন্তু পদ্ধতি দেশকালপাত্রভেদে পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞানের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও বিভিন্ন সমাজের উপযোগী পদ্ধতি গড়িয়া উঠিতে পারে, এবং একই পদ্ধতি পরিবর্তিত হইয়াও আপন সমাজগত বৈশিষ্ট্য ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখিতে পারে।

বিলাতের লোক টেবিলে চীনামাটির বাসন কাচের গ্লাস ইত্যাদির সাহায্যে রুটি মাংস মদ খায়। আমাদের দেশের লোকের সামর্থ্য ও ও রুচি অন্যবিধ, তাই ভূমিতে বসিয়া কলাপাতা বা পিতল কাঁসার বাসনে ভাত ডাল জল খায়। উদ্দেশ্য এক, কিন্তু পদ্ধতি ভিন্ন। হইতে পারে বিলাতী পদ্ধতি অধিকতর সভ্য ও স্বাস্থ্যের অনুকূল। কিন্তু কলাপাতে ভাত ডাল খাইলেও বিজ্ঞানের অবমাননা হয় না। দেশীয় পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আলু কপির ব্যবহার বিলাত হইতে শিখিয়াছি, কিন্তু দেশী প্রথায় রাঁধি। গ্লাসে জল খাইতে শিখিয়াছি, কিন্তু দেশী রুচি অনুসারে পিতল কাঁসার গড়ি। এইরূপ অনেক জিনিস অনেক প্রথা একটু বদলাইয়া বা পুরাপুরি লইয়া আপন পদ্ধতির অঙ্গীভূত করিয়াছি। অনেক দুষ্ট প্রথা শিখিয়া ভুল করিয়াছি, কিন্তু যদি নির্বিচারে ভাল মন্দ সকল বিদেশী প্রথাই বর্জন করিতাম তবে আরও বেশী ভুল করিতাম।

চাকা-সংযুক্ত গাড়ি যে একটা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা পূর্বে বলিয়াছি। আমি যদি ধনী হই এবং আমার দেশের রাস্তা যদি ভাল হয় তবে আমি মোটরে যাতায়াত করিতে পারি। কিন্তু যদি আমার অবস্থা মন্দ হয়, অথবা পল্লীগ্রামের কাঁচা অসম পথে যাইতে হয়, অথবা যদি অন্য গাড়ি না জোটে, তবে আমাকে গরুর গাড়িই চড়িতে হইবে। আমি জানি, গোযান অপেক্ষা মোটরযান বহু বিষয়ে উন্নত এবং মোটরে যতপ্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যাপার আছে গোযানে তাহার শতাংশের একাংশও নাই। তথাপি আমি গরুর গাড়ি নির্বাচন করিলে বিজ্ঞানকে অস্বীকার করিব না। মোটরে যে অসংখ্য জটিল বৈজ্ঞানিক কৌশলের সমবায় আছে তাহা আমার অবস্থার অনুকূল নয়, অথচ যে

সামান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর গরুর গাড়ি নির্মিত তাহাতে আমার কার্যোদ্ধার হয়। কিন্তু যদি গরুর গাড়ির মাঝে চাকা না বসাইয়া শেষ প্রান্তে বসাই অথবা ছোট বড় চাকা লাগাই তবে অবৈজ্ঞানিক কার্য হইবে। অথবা যদি আমাকে অন্ধকারে দুর্গম পথে যাইতে হয়, এবং কেহ গাড়ির সম্মুখে লণ্ঠন বাঁধিবার যুক্তি দিলে বলি—গরুর গাড়ির সামনে কস্মিন্‌কালে কেহ লণ্ঠন বাঁধে নাই, অতএব আমি এই অনাচার দ্বারা সনাতন গোযানের জাতিনাশ করিতে পারি না—তবে আমার মূর্খতাই প্রমাণিত হইবে। পক্ষান্তরে যদি মোটরের প্রতি অন্ধ ভক্তির বশে মনে করি—বরং বাড়িতে বসিয়া থাকিব তথাপি অসভ্য গোযানে চড়িব না—তবে হয়তো আমার পঙ্গুত্বপ্রাপ্তি হইবে।

কেহ যেন মনে না করেন আমি কবিরাজী পদ্ধতিকে গরুর গাড়ির তুল্য হীন এবং ডাক্তারীকে মোটরের তুল্য উন্নত বলিতেছি। আয়ুর্বেদ-ভাণ্ডারে এমন অনেক তথ্য নিশ্চয় আছে যাহা শিখিলে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসকগণ ধন্য হইবেন। আমার ইহাই বক্তব্য যে উদ্দেশ্যসিদ্ধি একাধিক পদ্ধতিতে হইতে পারে, এবং অবস্থাবিশেষে অতি প্রাচীন অথবা অনুন্নত উপায়ও বিজ্ঞজনের গ্রহণীয়—যদি অন্ধ সংস্কার না থাকে এবং প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুসারে পরিবর্তন করিতে দ্বিধা না থাকে। এই পরিবর্তন বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যবিধান বিষয়ে কেবল যে কবিরাজী পদ্ধতি উদাসীন তাহা নয়, ডাক্তারীও সমান দোষী। ডাক্তারী পদ্ধতি বিলাত হইতে যথাযথ উঠাইয়া আনিয়া এদেশে স্থাপিত করা হইয়াছে। তাহাতে যে নিত্যবর্ধমান তথ্য আছে সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইতে পারে না। কিন্তু তাহার ঔষধ কেবল বিলাতে জাত ঔষধ, তাহার পথ্য বিলাতেরই পথ্য। এদেশে পাওয়া যায় কিনা, অনুরূপ বা উৎকৃষ্টতর

কিছু আছে কিনা তাহা ভাবিবার দরকার হয় না। দেশীয় উপকরণে আস্থা নাই, কারণ তাহার সহিত পরিচয় নাই। যাহা আবশ্যক তাহা বিদেশ হইতে আসিবে অথবা বিলাতী রীতিতেই এদেশে প্রস্তুত হইবে। চিকিৎসার সমস্ত উপকরণ বিলাতের জ্ঞান বুদ্ধি অভ্যাস ও রুচি অনুসারে উৎকৃষ্ট ও সুদৃশ্য হওয়া চাই, আধেয় অপেক্ষা আধারের খরচ বেশী হইলেও ক্ষতি নাই, এই দরিদ্র দেশের সামর্থ্যে না কুলাইলেও আপত্তি নাই। দেশসুদ্ধ লোকের ব্যবস্থা নাই হইল, যে কয়জনের হইবে তাহা বিলাতের মাপকাঠিতে প্রকৃষ্ট হওয়া চাই। কাঙালী ভোজনের টাকা যদি কম হয় তবে বরঞ্চ জনকতককে পোলাও খাওয়ানো হইবে কিন্তু সকলকে মোটাভাত দেওয়া চলিবে না। বর্তমান সরকারী ব্যবস্থায় ইহাই দাঁড়াইয়াছে।

একদল পুরাতনকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য বিজ্ঞানের পথ বন্ধ করিয়াছেন, আর একদল পুরাতনকে অগ্রাহ্য করিয়া বিজ্ঞানের এবং বিলাসিতার প্রতিষ্ঠা করিতে চান। একদিকে অসংস্কৃত সুলভ ব্যবস্থা, অন্যদিকে অতিমার্জিত উপচারের ব্যয়বাহুল্য। আমাদের কবিরাজ ও ডাক্তারগণ যদি নিজ নিজ পদ্ধতিকে কুসংস্কারমুক্ত এবং দেশের অবস্থার উপযোগী করিতে চেষ্টা করেন তবে ক্রমশ উভয় পদ্ধতির সমন্বয় হইয়া এদেশের উপযোগী জীবন্ত আয়ুর্বেদের উদ্ভব হইতে পারে। যাঁহারা এই উদ্যোগে অগ্রণী হইবেন তাঁহাদিগকে দেশী বিদেশী উভয়বিধ পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে এবং পক্ষপাত বর্জন করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পদ্ধতি হইতে বিজ্ঞানসম্মত বিধান এবং চিকিৎসার যথাসম্ভব দেশীয় উপায় নির্বাচন করিতে হইবে। কেবল উৎকর্ষের দিকেই লক্ষ রাখিলে চলিবে না, যাহাতে চিকিৎসার উপায় বহুপ্রসারিত, দরিদ্রের সাধ্য এবং সুদূর

পল্লীতেও সহজপ্রাপ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এজন্য যদি নূতন এক শ্রেণীর চিকিৎসক সৃষ্টি করিতে হয় এবং ব্যয়লাঘবের জন্য নিকৃষ্ট প্রণালীতে ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাও স্বীকার্য। কবিরাজী পাচন অরিষ্ট চূর্ণ মোদক বটিকাদির প্রস্তুতপ্রণালী যদি অল্পব্যয়সাপেক্ষ হয় তবে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। এপ্রকার ঔষধ যদি ডাক্তারী টিংচার প্রভৃতির তুল্য প্রমাণসম্মত বা standardized অথবা অসার অংশ বর্জিত না হয়, তাহাতেও আপত্তি নাই। দেশের যে অসংখ্য লোকের ভাগ্যে কোনও চিকিৎসাই জুটে না তাহাদের পক্ষে মোটামুটি ব্যবস্থাও ভাল। ইহাতে চিকিৎসাবিদ্যার অবনতি হইবার কারণ নাই, যাহার সামর্থ্য ও সুযোগ আছে সে প্রকৃষ্ট চিকিৎসাই করাইতে পারে। অবশ্য যদি দেশের অবস্থা উন্নত হয় তবে নিম্নস্তরের চিকিৎসাও ক্রমে উচ্চস্তরে পৌঁছিবে।

কবিরাজগণ দেশীয় ঔষধের গুণাবলী এবং প্রস্তুতপ্রণালীর সহিত সুপরিচিত। ঔষধের বাহ্য আড়ম্বরের উপর তাঁহাদের অন্ধভক্তি নাই। পক্ষান্তরে ডাক্তারগণের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা অধিকতর উন্নত। অতএব উভয় পক্ষের মতবিনিময় না হইলে এই সমন্বয় ঘটিবে না।

এইপ্রকার চিকিৎসা-সংস্কারের জন্য সরকারী সাহায্য আবশ্যক। প্রচলিত কবিরাজী পদ্ধতিকে সাহায্য করিলে দেশে চিকিৎসার অভাব অনেকটা দূর হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে না, ডাক্তারির ব্যয়বাহুল্য এবং কবিরাজির গতানুবর্তিতা কমিবে না। যদি অর্থ ও উদ্যমের সৎপ্রয়োগ করিতে হয় তবে সরকারী সাহায্যে এইপ্রকার অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়া উচিত —

১। ডাক্তারী স্কুল-কলেজে পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে আয়ুর্বেদকে স্থান

দেওয়া। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র না পড়িলে যেমন ফিলসফি-শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে, চিকিৎসাবিদ্যাও তেমনই আয়ুর্বেদের অপরিচয়ে খর্ব হয়।

২। সাধারণের চেষ্টায় যেসকল আয়ুর্বেদীয় বিদ্যাপীঠ গঠিত হইয়াছে বা হইবে তাহাদের সাহায্য করা। সাহায্যের শর্ত এই হওয়া উচিত যে চিকিৎসাবিদ্যার আনুষঙ্গিক আধুনিক বিজ্ঞানসকলের যথাসম্ভব শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। বিলাতী ফার্মাকোপিয়ার অনুরূপ এদেশের উপযোগী সাধারণ-প্রয়োজ্য ঔষধসকলের তালিকা ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী সংকলন। ডাক্তারী চিকিৎসায় যদিও অসংখ্য ঔষধ প্রচলিত আছে তথাপি ফার্মাকোপিয়া-ভুক্ত ঔষধসকলেরই ব্যবহার বেশী। বিলাতে গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিয়োজিত সমিতি দ্বারা এই ভৈষজ্যতালিকা প্রস্তুত হয়। দশ পনর বৎসর অন্তর ইহার সংস্করণ হয়, যেসকল ঔষধ অকর্মণ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তাহা বাদ দেওয়া হয়, সুপরীক্ষিত নূতন ঔষধ গৃহীত হয় এবং প্রয়োজনবোধে ঔষধ তৈয়ারির নিয়মও পরিবর্তিত হয়। এদেশে এককালে শার্ঙ্গধর এইরূপ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সকল সভ্য দেশেরই আপন ফার্মাকোপিয়া আছে এবং তাহা দেশের প্রথা ও রুচি অনুসারে সংকলিত হইয়া থাকে। এদেশের ফার্মাকোপিয়া বর্তমান কালের উপযোগী সুপরীক্ষিত যথাসম্ভব দেশীয় উপাদানের সন্নিবেশ হওয়া উচিত। ঔষধ তৈয়ারির যেসকল ডাক্তারী প্রণালী আছে তাহার অতিরিক্ত আয়ুর্বেদীয় প্রণালীও থাকা উচিত। অবশ্য যেসকল ঔষধ বা প্রণালী বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, অখ্যাত বা অপরীক্ষিত তাহা বর্জিত হইবে। কেবল কিংবদন্তীর উপর অত্যধিক নির্ভর অকর্তব্য। কিন্তু দেশীয় অমুক ঔষধ বা প্রণালী বিলাতী অমুক ঔষধ বা প্রণালীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট

বলিয়াই বর্জিত হইবে না, ব্যয়লাঘব ও সৌকর্যের উপরেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এপ্রকার ভৈষজ্যতালিকা প্রস্তুত করিতে হইলে পক্ষপাতহীন উদারমতাবলম্বী ডাক্তার ও কবিরাজের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। এই সংযোগ দুঃসাধ্য, কিন্তু চেষ্টা না করিয়াই হতাশ হইবার কারণ নাই। এখন ডাক্তারগণই প্রবল পক্ষ, সুতরাং প্রথম উদ্যমে তাঁহারাই একযোগে সাক্ষী ও বিচারকের আসন গ্রহণ করিবেন এবং কবিরাজগণকে কেবল সাক্ষ্য দিয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইবে। প্রথম যাহা দাঁড়াইবে তাহা যতই সামান্য হউক, শিক্ষার বিস্তার ও জ্ঞানবিনিময়ের ফলে ভবিষ্যতের পথ ক্রমশ সুগম হইবে।

৪। দাতব্য চিকিৎসালয়ে যথাসম্ভব পূর্বোক্ত দেশীয় উপাদান ও দেশীয় প্রণালীতে প্রস্তুত ঔষধের প্রয়োগ। যেসকল নূতন চিকিৎসক আয়ুর্বেদ ও আধুনিক বিজ্ঞান উভয়বিধ বিদ্যায় শিক্ষিত হইবেন তাঁহারা সহজেই এইসকল নূতন ঔষধ আয়ত্ত করিতে পারিবেন। এদেশের প্রতিষ্ঠাবান অনেক ডাক্তার আয়ুর্বেদকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও এইসকল নবপ্রবর্তিত দেশীয় ঔষধের প্রচলনে সাহায্য করিতে পারেন।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা কার্যে পরিণত করা অর্থ উদ্যম ও সময় সাপেক্ষ। কিন্তু আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতিকে কালোপযোগী করা এবং চিকিৎসার উপায় সাধারণের পক্ষে সুলভ করার অন্যবিধ পন্থা খুঁজিয়া পাই না। সরকারী সাহায্য মিলিলেই কার্যোদ্ধার হইবে না, চিকিৎসক অচিকিৎসক সকলেরই উৎসাহ আবশ্যক। মোট কথা, যদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোভাব এমন হয় যে, জ্ঞান সর্বত্র আহরণ করিব, কিন্তু জ্ঞানের প্রয়োগ দেশের সামর্থ্য অভ্যাস ও রুচি অনুসারে করিব, তবেই উদ্দেশ্যসিদ্ধি সহজ হইবে।

ভদ্র জীবিকা

(১৩৩২)

বাংলার ভদ্রলোকের দুরবস্থা হইয়াছে তাহাতে দ্বিমত নাই। দেশের অনেক মনীষী প্রতিকারের উপায় ভাবিতেছেন এবং জীবিকানির্বাহের নূতন পন্থা নির্দেশ করিতেছেন। কিন্তু বর্তমান সমস্যার সমাধান যে উপায়েই হউক, তাহা শীঘ্র ঘটিয়া উঠিবে না। রোগের বীজ ধীরে ধীরে সমাজে ব্যাপ্ত হইয়াছে, ঔষধনির্বাচন মাত্রই রোগমুক্তি হইবে না। সতর্কতা চাই, ধৈর্য চাই, উপায়ের প্রতি শ্রদ্ধা চাই। রোগের নিদান একটি নয়, নিবারণের উপায়ও একটি হইতে পারে না। যে যে উপায়ে প্রতিকার সম্ভবপর বোধ হয় তাহার প্রত্যেকটি সাবধানে নির্বাচন করা উচিত, নতুবা ভুল পথে গিয়া দুর্দশার কালবৃদ্ধি হইবে।

দুর্দশা কেবল ভদ্রসমাজেই বর্তমান এমন নয়। কিন্তু সমগ্র বাঙালী-সমাজের অবস্থার বিচার আমার উদ্দেশ্য নয়, সেজন্য কেবল তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর কথাই বলিব। 'ভদ্র' বলিলে যে শ্রেণী বুঝায় তাহাতে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলেই আছেন। অন্যধর্মীর ভদ্রসমাজে ঠিক কি ভাবে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা আমার জানা নাই, সেজন্য হিন্দু ভদ্রের কথাই বিশেষ করিয়া বলিব। প্রতিকারের পন্থা যে সকলের পক্ষেই সমান তাহা বলা বাহুল্য।

শতাধিক বৎসর পূর্বে 'ভদ্র' বলিলে কেবল ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ এবং অপর কয়েকটি সম্প্রদায় মাত্র বুঝাইত। ভদ্রের উৎপত্তি প্রধানত জন্মগত

হইলেও একটা গুণকর্মবিভাগজ বিশিষ্টতা সেকালেও ছিল। ভদ্রের প্রধান বৃত্তি ছিল—জমিদারি বা জমির উপসত্ব ভোগ, জমিদারের অধীনে চাকরি অথবা তেজারতি। বহু ব্রাহ্মণ যাজন ও অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতেন, অধিকাংশ বৈদ্য চিকিৎসা করিতেন। ভদ্রশ্রেণীর অল্প কয়েকজন রাজকার্য করিতেন, এবং কদাচিৎ কেহ কেহ নবাগত ইংরেজ বণিকের অধীনে চাকরি লইতেন। বাণিজ্যবৃত্তি নিম্নতর সমাজেই আবদ্ধ ছিল। ভদ্র গৃহস্থ প্রতিবেশী ধনী বণিককে অবজ্ঞার চক্ষুতেই দেখিতেন। উভয় গৃহস্থের মধ্যে সামাজিক সদ্ভাব থাকিলেও ঘনিষ্ঠতা ছিল না। উচ্চবর্ণের লোকেরা জমিদারি এবং মামলা পরিচালনের দক্ষতাকেই বৈষয়িক বিদ্যার পরাকাষ্ঠা মনে করিতেন, প্রতিবেশী বণিক কোন্ বিদ্যার সাহায্যে অর্থ উপার্জন করিতেছেন তাহার সন্ধান লইতেন না। বণিকের জাতিগত নিকৃষ্টতা এবং অমার্জিত আচারব্যবহারের সঙ্গে তাঁহার অর্থকরী বিদ্যাও ভদ্রসমাজে উপেক্ষিত হইত। এই সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এখনও বর্তমান, কেবল প্রভেদ এই — বাঙালী বণিকও তাঁহাদের বংশপরম্পরালব্ধ বিদ্যা হারাইতে বসিয়াছেন। আর, যাঁহারা ভদ্র বলিয়া গণ্য তাঁহারা এতদিন তাঁহাদের অতি নিকট প্রতিবেশীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে অন্ধ থাকিয়া আজ হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছেন যে ব্যবসায় না শিখিলে তাঁদের আর চলিবে না।

একালের তুলনায় সেকালের ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। কিন্তু তখন বিলাসিতা কম ছিল, অভাব কম ছিল, জীবনযাত্রাও অল্প ব্যয়ে নির্বাহ হইত। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে এক যুগান্তর আসিল। বাঙালী বুঝিল—এই নূতন বিদ্যায় কেবল জ্ঞানবৃদ্ধি নয়, অর্থাগমেরও সুবিধা হয়। কেরানীযুগের সেই আদি কালে

সামান্য ইংরেজী জ্ঞান থাকিলেই চাকরি মিলিত। অনেক ভদ্রসন্তানেরই সেরেস্তার কাজের সহিত বংশানুক্রমে পরিচয় ছিল, সুতরাং সামান্য চেষ্টাতেই তাঁহারা নূতন কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। জনকতক অধিকতর দক্ষ ব্যক্তির ভাগ্যে উচ্চতর সহকারী চাকরিও জুটিল। আবার যাঁহারা সর্বাপেক্ষা সাহসী ও উদ্‌যোগী তাঁহারা নূতন বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ওকালতি ডাক্তারি প্রভৃতি স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তখন প্রতিযোগিতা কম ছিল, অর্থাগমের পথও উন্মুক্ত ছিল।

এইরূপে ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রশ্রেণী নূতন জীবিকার সন্ধান পাইলেন। বাঙালী ভদ্রসন্তানই ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রণী ছিলেন, সুতরাং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে তাঁহাদের সাদর নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। অর্থাগম এবং ইংরেজের অনুকরণের ফলে বিলাসিতা বাড়িতে লাগিল, জীবনযাত্রার প্রণালীও ক্রমশ পরিবর্তিত হইতে লাগিল। এই সকল নূতন ধনীর প্রতিপত্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইঁহাদের উপার্জনের পরিমাণ যাহাই হউক, কিন্তু কি বিদ্যা! কেমন চালচলন! ভদ্রসন্তান দলে দলে এই নূতন মার্গে ছুটিল। সেকালে নিষ্কর্মা ভদ্রলোকের সংখ্যা এখানকার অপেক্ষা বেশী ছিল, কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারে একজনের রোজগারে অনেক বেকারের ভরণপোষণ হইত। সভ্যতা ও বিলাসিতা বৃদ্ধির সঙ্গে উপার্জকের নিজ খরচ বাড়িয়া চলিল, বেকারগণ অবজ্ঞাত হইতে লাগিলেন। এতদিন যাঁহারা আত্মীয়ের উপর নির্ভর করাই স্বাভাবিক মনে করিতেন, অভাবের তাড়নায় তাঁহারাও চাকরির উমেদার হইলেন। অপর শ্রেণীর লোকেরাও পৈতৃক ব্যবসায় ছাড়িয়া সম্মান বৃদ্ধির আশায় ভদ্রের পদানুসরণ করিতে লাগিলেন।

ভদ্রের প্রাচীন সংজ্ঞার্থ পরিবর্তিত হইল। ভদ্রতার লক্ষণ দাঁড়াইল

—জীবনযাত্রার প্রণালীবিশেষ। ভদ্রতালাভের উপায় হইল—বিশেষ-প্রকার জীবিকা গ্রহণ। এই জীবিকার বাহন হইল স্কুল কলেজের বিদ্যা, এবং জীবিকার অর্থ হইল—উক্ত বিদ্যার সাহায্যে যাহা সহজে পাওয়া যায়, যথা চাকরি।

নূতন কূপের সন্ধান পাইয়া কয়েকটি ভদ্রমণ্ডুক সেখানে আশ্রয় লইয়াছিল। কিন্তু কূপের মহিমা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, মাঠের মণ্ডূক হাটের মণ্ডূক দলে দলে কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া ভদ্রতালাভ করিল। কূপমণ্ডুকের দলবৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু আহার্য ফুরাইয়াছে।

ভদ্রের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। সকল জীবিকা ভদ্রের গ্রহণীয় নয়, কেবল কয়েকটি জীবিকাতেই ভদ্রতা বজায় থাকিতে পারে। সেকালের তুলনায় এখন ভদ্রোচিত জীবিকার সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে, কিন্তু ভদ্রের সংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে বাড়ে নাই। কেতাবী বিদ্যা অর্থাৎ স্কুল-কলেজে লব্ধ বিদ্যা যে জীবিকায় প্রয়োগ করা যায় তাহাই সর্বাপেক্ষা লোভনীয়। কেরানীগিরির বেতন যতই অল্প হউক, ওকালতিতে পসারের সম্ভাবনা যতই কম হউক, তথাপি এসকলে একটু কেতাবী বিদ্যা খাটাইতে পারা যায়। মুদিগিরি পুরানো লোহা বিক্রয় বা গরুর গাড়ির ঠিকাদারিতে বিদ্যাপ্রয়োগের সুযোগ নাই, সুতরাং এসকল ব্যবসায় ভদ্রোচিত নয়। কিন্তু কেতাবী বৃত্তিতে যখন আর অন্নের সংস্থান হয় না, তখন অপর বৃত্তি গ্রহণ ভিন্ন উপায় নাই। নিতান্ত নাচার হইয়া বাঙালী ভদ্রসন্তান ক্রমশ অকেতাবী বৃত্তিও লইতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু খুব সন্তর্পণে বাছিয়া লইয়া। যে বৃত্তি পুরাতন এবং নিম্নশ্রেণীর সহিত জড়িত তাহা ভদ্রের অযোগ্য। কিন্তু যাহার নূতন আমদানি হইয়াছে কিংবা যাহার ইংরেজী নামই প্রচলিত, সেরূপ বৃত্তিতে ভদ্রতার তত হানি হয় না। ছুতারের

কাজ, ধোবার কাজ, কোচম্যানি, মুদিগিরি চলিবে না; কিন্তু ঘড়ি বা বাইসিকেল মেরামত, নকশা আঁকা, ডাইং-ক্লিনিং, চাএর দোকান, মাংসের হোটেল, স্টেশনারি-শপ—এসকলে আপত্তি নাই, কারণ সমস্তই আধুনিক বা ইংরেজী নামে পরিচিত।

কিন্তু এইসকল নূতন বৃত্তিতে বেশী রোজগার করা সহজ নয়। দরিদ্র ভদ্রসন্তান উহা গ্রহণ করিয়া কোনও রকমে সংসার চালাইতে পারে, কিন্তু যাহাদের উচ্চ আশা তাহারা কি করিবে? চাকরি দুর্লভ, উকিলে দেশ ছাইয়া গিয়াছে, ডাক্তারিতে পসার অনিশ্চিত, এঞ্জিনিয়ার প্রফেসার প্রভৃতি বিদ্যাজীবীর পদও বেশী নাই। বিলাতে অনেকে পাদরী হয়, সৈনিক হয়, নাবিক হয়; কিন্তু বাঙালীর ভাগ্যে এসকল বৃত্তি নাই।

বাঙালী ভদ্রলোক অন্ধকূপে পড়িয়াছে, তাহার চারিদিকে গণ্ডি। গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিতে সে ভয় পায়, কারণ সেখানে সমস্তই অজ্ঞাত অনিশ্চিত। কে তাহাকে অভয়দান করিবে?

অনেকেই বলিতেছেন—অর্থকরী বিদ্যা শিখাও, ইউনিভার্সিটির পাঠ্য বদলাও। ছেলেরা অল্পবয়স হইতে হাতে কলমে কাজ করিতে শিখুক, তাহার পর একটু বড় হইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্প-উৎপাদন শিখুক। যাহারা বিজ্ঞান বোঝে না তাহারা banking, accountancy, economics প্রভৃতিতে মন দিক। দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার হইলেই বেকারের সমস্যা কমিবে।

উত্তম কথা, কিন্তু অতি বৃহৎ কার্য। রোগ নির্ণয় হইয়াছে, ঔষধের ফর্দও প্রস্তুত, কিন্তু এখনও অনেক উপকরণ সংগ্রহ হয় নাই, মাত্রাও স্থির হয় নাই, রোগীকে কেবল আশ্বাস দেওয়া হইতেছে। ঔষধসেবনে যদি বাঞ্ছিত সুফল না হয় তবে সে নিরাশায় মরিবে। অতএব প্রত্যেক

উপকরণের ফলাফল বিচার কর্তব্য, যাহাতে রোগীর কাছে সত্যের অপলাপ না হয়।

প্রথম ব্যবস্থা—সাধারণ বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের হাতে-কলমে কাজ শেখানো। আমার যতটা জানা আছে, এই কাজের প্রচলিত অর্থ—ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, দরজীর কাজ, সুতা কাটা, তাঁত বোনা, নক্শা করা ও কৃষি। যে সকল ছাত্রের ঐ জাতীয় কাজ কৌলিক ব্যবসায়, কিংবা যাহারা ভবিষ্যতে ঐ কাজ বৃত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিবে, তাহাদের পক্ষে উক্ত প্রকার শিক্ষা নিশ্চয় হিতকর। যাহারা অবস্থাপন্ন এবং রোজগার সম্বন্ধে উচ্চ আশা রাখে, তাহারাও উপকৃত হইবে, কারণ মনুষ্যত্ববিকাশের জন্য যেমন বুদ্ধির পরিচর্যা ও ব্যায়ামশিক্ষা আবশ্যক, হাতের নিপুণতা তেমনই আবশ্যক। কিন্তু উচ্চাভিলাষী ছাত্রের পক্ষে এইপ্রকার শিক্ষার কেবল গৌণভাবেই হিতকর, মুখ্যভাবে উপার্জনের কোনও সহায়তা করিবে না।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা—বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্পশিক্ষা। Mechanical ও electrical engineering, agriculture, surveying, banking, accountancy ইত্যাদি শিখাইবার ব্যবস্থা অল্পবিস্তর আছে। এখন কয়েকপ্রকার নূতন শিল্প শিখাইবার চেষ্টা হইতেছে, যথা—চামড়া, সাবান, কাচ, চীনামাটির জিনিস, বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি তৈয়ারি এবং সুতা ও কাপড় রং করার প্রণালী। উদ্দেশ্য এই যে দেশে অনেক নূতন ব্যবসায় ও শিল্পের প্রতিষ্ঠা দ্বারা শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইবে। উল্লিখিত কয়েকটি বিদ্যা, যথা—engineering, accountancy ইত্যাদি শিখিলে চাকরির ক্ষেত্র কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যবসায় ও শিল্পের প্রতিষ্ঠা কি পরিমাণে হইবে তাহা ভাবিবার বিষয়।

চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে উচ্চশিক্ষা বলিলে সাধারণত সাহিত্য ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি বুঝাইত। ছাত্র ও অভিভাবকগণ যখন দেখিলেন যে কেবল এইপ্রকার শিক্ষায় জীবিকালাভ দুর্ঘট, তখন অনেকের মন বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকিল। একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মিল যে, বিজ্ঞানই হইল প্রকৃত কার্যকরী বিদ্যা; বিজ্ঞান শিখিলেই শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন করিবার ক্ষমতা হইবে এবং ভদ্রসন্তানের জীবিকাও জুটিবে। তখন কাব্য সাহিত্য দর্শনের মায়া ত্যাগ করিয়া ছাত্রগণ দলে দলে বিজ্ঞান শিখিতে আরম্ভ করিল বি. এস-সি এম. এস-সিতে দেশ ছাইয়া গেল। কিন্তু কোথায় শিল্প, কোথায় পণ্য? আত্মীয়স্বজন ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—এত সায়েন্স শিখিয়াও ছোকরা শেষে কেরানী বা উকিল হইল! হায়, ছোকরা কি করিবে? বিজ্ঞান ও কার্যকরী বিদ্যা এক নয়। কেমেস্ট্রি ফিজিক্স পড়িলেই পণ্য উৎপাদন করা যায় না, এবং কোনও গতিকে উৎপন্ন করিলেই তাহা বাজারে চলে না।

এখন আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি যে বিজ্ঞানে পণ্ডিত হইলেই বিজ্ঞানের প্রয়োগে দক্ষতা জন্মে না। সে বিদ্যা আলাদা, যাহাকে বলে technical education। অতএব উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে উপযুক্ত সরঞ্জামের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্প শিখিতে হইবে। শিক্ষার পদ্ধতি নির্বাচনে ভুল করিয়া পূর্বে হতাশ হইয়াছি, এবারেও কি আশা নাই? সাবান কাচ চামড়া শিখিয়াও কি শেষে কেরানীগিরি বা ওকালতি করিতে হইবে?

আশা পূর্বেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু আশার মাত্রা অসংগত ছিল তাই ঠিক যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা পাই নাই, এবং এবারেও হয়তো সম্ভাব্যের অতিরিক্ত ফল কামনা করিতেছি।

বিজ্ঞানে শিল্পজাত দ্রব্যের যে উল্লেখ থাকে তাহা উদাহরণরূপেই থাকে, উৎপাদনের প্রণালী তন্ন তন্ন করিয়া বলা হয় না এবং ব্যবসায় সম্বন্ধে কোনও উপদেশ দেওয়া হয় না। বিজ্ঞানপাঠে কয়েকটি শিল্প সম্বন্ধে একটা স্থূল জ্ঞান লাভ হয়, এবং দেশবাসীর মধ্যে এই জ্ঞান যত বিস্তৃত হয় শিল্পবৃদ্ধির সম্ভাবনাও তত অধিক হয়। যেসকল কারণ বর্তমান থাকিলে দেশে শিল্পবৃদ্ধি সহজ হয়, বিজ্ঞানশিক্ষা তাহার অন্যতম কারণ, প্রধান কারণও বটে, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়।

তাহার পর technical education বা শিল্পশিক্ষা। ইহার অর্থ— যে প্রণালীতে শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয় সেই প্রণালীর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়। অনেকে মনে করেন ইহাই শিল্প-প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত ব্যবস্থা। এই বিশ্বাস কতদূর সংগত তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত।

বিজ্ঞানে খাদ্য সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, কিন্তু খাদ্য তৈয়ারি বা রন্ধন সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ নাই। বিজ্ঞান পড়িলে রন্ধন শেখা যায় না, তাহার জন্য দক্ষ ব্যক্তির কাছে হাতা-খন্তির ব্যবহার অভ্যাস করিতে হয়। এই শিক্ষা লাভ করিলে পাচকের চাকরি মিলিতে পারে এবং অবস্থা অনুসারে অভ্যস্ত রীতির একটু আধটু বদল করিলে মনিবকেও খুশী করা যায়। আয়ব্যয়ের কথা ভাবিতে হয় না, তাহা মনিবের লক্ষ্য। কিন্তু যদি কোনও উচ্চাভিলাষী লোক রন্ধনবিদ্যাকে একটা বড় কারবারে লাগাইতে চায়, অর্থাৎ হোটেল খুলিয়া জনসাধারণকে রন্ধনশিল্পজাত পণ্য বিক্রয় করিতে চায়, তবে কেবল পাচকের অভিজ্ঞতাতেই কুলাইবে না, বিস্তর নূতন সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। মূলধন চাই, উপযুক্ত জায়গায় বাড়ি চাই, উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত মূল্যে কাঁচামাল খরিদ চাই, লোক খাটাইবার ক্ষমতা চাই, যথাকালে বহুলোকের আহার্য সরবরাহ

চাই, হিসাব রাখা, টাকা আদায়, আয়ব্যয় খতাইয়া লাভ-লোকসান নির্ণয় প্রভৃতি নানা বিষয়ে সূক্ষ্মদৃষ্টি চাই। এই অভিজ্ঞতা কোনও শিক্ষালয়ে পাওয়া যায় না।

সর্বপ্রকার শিল্প এবং ব্যবসায়ের পথই এইরূপ অত্যধিক দুর্গম। শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করা যাহার ব্যবসায়, সে ঠিক কি প্রণালী অবলম্বন করে এবং কোন্ উপায়ে ব্যবসায়ের কঠোর প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করে তাহা অপরকে জানিতে দেয় না। সুতরাং technical education পাইলেই ব্যবসায়বুদ্ধি জন্মিবে না এবং শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইবে না। চাকরি মিলিতে পারে, কিন্তু তাহার ক্ষেত্র সংকীর্ণ, কারণ দেশে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের সংখ্যা অল্প। শিক্ষা শেষ হইলেই অধিকাংশ যুবক স্বাধীন কারবার আরম্ভ করিতে পারিবে ইহা দুরাশা মাত্র।

যাহা বলা হইল তাহার ব্যতিক্রমের উদাহরণ অনেক আছে। অনেক দৃঢ়সংকল্প উদ্‌যোগী ব্যক্তি কেবল পুঁথিগত বিজ্ঞান চর্চা করিয়া কিম্বা বিজ্ঞানের কোনও চর্চা না করিয়া এবং অপরের সাহায্য না পাইয়াও শিল্পপ্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। বিজ্ঞানচর্চা এবং কার্যকরী শিক্ষার বিস্তারের ফলে এই সুযোগ বর্ধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ পূর্বে যদি এক লক্ষ শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে একজন শিল্পপ্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য হইয়া থাকেন, তবে এখন হয়তো দশজন হইবেন। নূতন শিক্ষাপদ্ধতি হইতে আমরা এইমাত্র আশা করিতে পারি যে কয়েকজনের নূতনপ্রকার চাকরি মিলিবে এবং কয়েকজন অনুকূল অবস্থায় পড়িলে স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। কিন্তু অধিকাংশের ভাগ্যে কোনও প্রকার সুবিধা লাভ হইবে না।

Technical educationকে নিরর্থক প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য

নয়। কেবল ইহাই বলিতে চাহি—যদি ছাত্রগণ অত্যধিক সংখ্যায় নির্বিচারে এই পথে জীবিকার সন্ধানে আসেন তবে তাঁহাদের অনেকেই বিফলমনোরথ হইবেন। কারণ, নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য নয়, এদেশে কারখানাও এত নাই যে যাহাতে যথেষ্ট চাকরি মিলিতে পারে। বিজ্ঞান সকলের রুচিকরও নয়। অতএব জীবিকালাভের অপেক্ষাকৃত সুগম পন্থা আর কিছু আছে কিনা দেখা উচিত।

বাংলাদেশ পরদেশীতে ভরিয়া গিয়াছে। তাহাদের এক দল এদেশের কুলী মজুর ধোবা নাপিত কামার কুমার মাঝী মিস্ত্রীকে স্থানচ্যুত করিতেছে, আর এক দল দেশী বণিকের হাত হইতে ছোট বড় সকল ব্যবসায় কাড়িয়া লইতেছে এবং নূতন ব্যবসায়ের পত্তন করিতেছে। শিক্ষিত বাঙালী লোলুপনেত্রে এই শেষোক্ত দলের কীর্তি দেখিতেছে কিন্তু তাহাদের পদ্ধতিতে দন্তস্ফুট করিতে পারিতেছে না। এইসকল পরদেশী ইংরেজী বিদ্যা জানে না, economics বোঝে না, ইহাদের হিসাবের প্রণালীও আধুনিক book-keeping হইতে অনেক নিকৃষ্ট, অথচ বাণিজ্যলক্ষ্মী ইহাদের ঘরেই বাসা লইয়াছেন। ইহারা বিজ্ঞানের খবর রাখে না, নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতেও খুব ব্যস্ত নয়, কারণ ইহারা মনে করে পণ্য উৎপাদন অপেক্ষা পণ্য লইয়া কেনাবেচা করাই বেশী সহজ এবং তাহাতে লাভের নিশ্চয়তাও অধিক। ইহারা নির্বিচারে দেশী বিলাতী প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় উপকারী অপকারী সকল পণ্যের উপরেই ব্যবসায়ের জাল ফেলিয়াছে। উৎপাদকের ভাণ্ডার হইতে ভোক্তার গৃহ পর্যন্ত বিস্তৃত ঋজুকুটিল নানা পথের প্রত্যেক ঘাটিতে দাঁড়াইয়া ইহারা পণ্য হইতে লাভ আদায় করিয়া লইতেছে।

শিক্ষিত বাঙালী কতক ঈর্ষার বশে কত অজ্ঞতার জন্য এইসকল

পরদেশীর কার্যপ্রণালী হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। ইহারা বর্বর অশিক্ষিত দুর্নীতিপরায়ণ, টাকার জন্য দেশের সর্বনাশ করিতেছে। ইহারা লোটাকম্বল সম্বল করিয়া এদেশে আসে; যা-তা খাইয়া যেখানে সেখানে বাস করিয়া অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া কৃপণের তুল্য অর্থসঞ্চয় করে। ধনী হইলেও ইহারা মানসিক সম্পদে নিঃস্ব। ভদ্র বাঙালী অত হীনভাবে জীবিকানির্বাহ আরম্ভ করিতে পারে না, তাহার ভব্যতার একটা সীমা আছে যাহার কমে তাহার চলে না। অতএব দগ্ধোদরের জন্য সে খোট্টার শিষ্য হইবে না।

অনেক বৎসর পূর্বে ইংরেজের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া বাঙালী ভাবিয়াছিল —ইংরেজের চালচলন অনুকরণ না করিলে উন্নতির আশা নাই। সে ভ্রম এখন গিয়াছে, বাঙালী বুঝিয়াছে মোটা চালচলনের সঙ্গে বিদ্যা বুদ্ধি উদ্যমের কোন বিরোধ নাই। এখন আবার অনেকে ভ্রমে পড়িয়া ভাবিতেছেন—খোট্টার অধিকৃত ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইলে জীবনযাত্রার প্রণালী অবনত করিতে হইবে এবং মানসিক উন্নতির আশা বিসর্জন দিতে হইবে।

যাহারা বাঙালীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে তাহাদের অনেক দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু এমন মনে করার কোনও হেতু নাই যে ঐসকল দোষের জন্যই তাহারা প্রতিযোগে জয়ী হইয়াছে। নিরপেক্ষ বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে বাঙালীর পরাভব তাহার নিজের ত্রুটির জন্যই হইয়াছে।

এইসকল পরদেশী বণিকের শিক্ষা ও পরিবেষ্টন সযত্ন অনুসন্ধানের যোগ্য। ইহারা জন্মাবধি বণিগ্‌বৃত্তির আবহাওয়ায় লালিত হইয়াছে এবং আত্মীয়স্বজনের নিকটেই দীক্ষা লাভ করিয়াছে। বাঙালী কেরানী

মার্চেণ্ট অফিসে গিয়া নির্লিপ্ত চিত্তে invoice voucher day-book ledger লিখিয়া দিনগত পাপক্ষয় করিয়া আসে, মনিবের সহিত তাহার কেবল বেতনের সম্পর্ক। সে নিজের নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করে মাত্র, মনিবের সমগ্র ব্যবসায় বুঝিবার তাহার সুযোগও নাই স্বার্থও নাই। ভারতীয় বণিকের অনেক কাজ গৃহেই নিষ্পন্ন হয়। তাহার সহায়তা করিয়া বণিকপুত্র অল্প বয়সেই পৈতৃক ব্যবসায়ের রস গ্রহণ করিতে শেখে, এবং কেনা বেচা আদায় উসুল জাবেদা রোকড় খাতিয়ান হাতচিঠা হুণ্ডি মোকাম বাজারের গূঢ় তত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করে।

এই business atmosphere বাঙালী ভদ্রের গৃহে দুর্লভ। উকিল ব্যারিস্টার ডাক্তার প্রোফেসার কেরানীর সন্তান ইহাতে বঞ্চিত। বণিগ্‌বৃত্তির বীজ বাঙালী ভদ্রের গৃহে নূতন করিয়া বপন করিতে হইবে। অনেক অঙ্কুর নষ্ট হইবে, কিন্তু অভিভাবকের উৎসাহ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিলে ফলবান বিটপীও অচিরে দেখা দিবে।

দালাল আড়তদার ব্যাপারী পাইকার দোকানী প্রভৃতি বহু মধ্যবর্তীর হাত ঘুরিয়া পণ্যদ্রব্য ভোক্তার ঘরে আসে। পণ্যের এই পরিক্রমপথে অগণিত ব্যক্তির অন্নসংস্থান হয়। এই মহাজন-অনুসৃত পথই জীবিকার রাজপথ। বাঙালী ভদ্রলোককে এই পথের বার্তা সংগ্রহ করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে।

আরম্ভ দুরূহ সন্দেহ নাই। অভিজ্ঞ অভিভাবকের উপদেশ পাইলে নূতন ব্রতীর পন্থা সুগম হইবে। কিন্তু যেখানে এ সুযোগ নাই সেখানেও শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক অনেক সাহায্য করিতে পারেন। পুত্রের শিক্ষার জন্য খরচ করিতে বাঙালী কুণ্ঠিত নয়। সাধারণ শিক্ষার জন্য যে অর্থ ও

উদ্যম ব্যয় হয় তাহারই কিয়দংশে ব্যবসায় শিক্ষা আরম্ভ হইতে পারে। অনেক উদার অভিভাবক এই উদ্দেশ্যে অর্থব্যয় করিয়া বাঞ্ছিত ফল পান নাই, ভবিষ্যতেও অনেকে পাইবেন না। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার ব্যয়ও সকল সময়ে সার্থক হয় না।

সকল যুবকই অবশ্য ব্যবসায়ী হইবে না। কিন্তু যে হইতে চাহিবে তাহার সংকল্প স্থির করিয়া পঠদ্দশাতেই বণিগ্‌বৃত্তির সহিত পরিচয় আরম্ভ করা ভাল। এজন্য অধিক আড়ম্বর অনাবশ্যক। আগে অর্থবিদ্যা শিখিব তাহার পর ব্যবসায় আরম্ভ করিব এরূপ মনে করিলে শিক্ষা অগ্রসর হইবে না। আগে ভাষা, তাহার পর ব্যাকরণ—ইহাই স্বাভাবিক রীতি। দোকান হাট বাজার আড়ত ব্যবসায়শিক্ষার সুগম বিদ্যাপীঠ। এই সকল স্থানে নিত্য যাতায়াত করিলে শিক্ষার্থী অনেক নূতন তথ্য শিখিবে; আমদানি, রপ্তানি, আড়তের বিক্রয়প্রথা, পণ্যের ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য, দালালের করণীয়, হিসাবের প্রণালী, পাওনা আদায়ের উপায়—ইত্যাদি বহু জটিল বিষয় সরল হইয়া যাইবে। অভিভাবক যদি শিক্ষার্থীর নিকট এইসকল সংবাদ গ্রহণ করেন তবে তিনিও উপকৃত হইবেন এবং শিক্ষার্থীকেও সাহায্য করিতে পারিবেন। সাধারণ শিক্ষা—অর্থাৎ স্কুল কলেজের শিক্ষা—শেষ হইলে শিক্ষার্থী দিনকতক কোনও ব্যবসায়ীর কর্মচারী হইয়া হাতেকলমে কাজ শিখিতে পারে। এদেশে ব্যবসায় শিখিবার জন্য premium দেওয়ার প্রথা নাই। কিন্তু যদি দিতেও হয় তাহা অপব্যয় হইবে না। যদি পছন্দমত কোনও নির্দিষ্ট ব্যবসায় শিখিবার সুযোগ না থাকে, তথাপি যেকোনও সমজাতীয় ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশি করায় লাভ আছে, কারণ সকল ব্যবসায়েরই কতকগুলি সাধারণ মূলসূত্র আছে। খুব বড় ব্যবসায়ীর অফিসে সুবিধা

হইবে না। সেখানে নানা বিভাগের মধ্যে দিগ্‌ভ্রম হইবে, সমগ্র ব্যাপারের শৃঙ্খলিত ধারণা সহজে জন্মিবে না।

শিক্ষানবিশি শেষ হইলে সামান্য মূলধন লইয়া কারবার আরম্ভ হইতে পারে। সুবিধা হইলে অভিজ্ঞ অংশীদারের সহিত বখরার বন্দোবস্ত হইতে পারে। অবশ্য প্রথম হইতেই জীবিকানির্বাহের উপযোগী লাভ হইবে না। কলেজে উচ্চশিক্ষা বা কার্যকরী বিদ্যা লাভ করিতে যে সময় লাগে, ব্যবসায় দাঁড় করাইতে তাহা অপেক্ষা কম সময় লাগিবে এরূপ আশা করা অসংগত। প্রথমে যে ছোট কারবার আরম্ভ হইবে তাহা হাতেখড়ি বলিয়াই গণ্য করা উচিত। তাহার পর অভিজ্ঞতা ও আত্মনির্ভরতা জন্মিলে কারবার সহজেই বৃদ্ধি পাইবে।

এইপ্রকার শিক্ষার জন্য এবং সামান্য মূলধনে ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হইলে যে কষ্টসহিষ্ণুতা আবশ্যক, শৌখিন বাঙালীর ধাতে তাহা সহিবে কি? নিশ্চয় সহিবে। বাঙালী যুবক অশেষ পরিশ্রম করিয়া রাত জাগিয়া মড়া ঘাঁটিয়া ডাক্তারি শেখে। উত্তপ্ত লোহার ঘরে জ্বলন্ত হাপরের কাছে লোহা পিটিয়া এঞ্জিনিয়ারিং শেখে। প্রখর রৌদ্রে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা দমন করিয়া সার্ভেয়িং শেখে। আইনপরীক্ষা পাস করিয়া বহু দিন মুরব্বী উকিলের বাড়িতে ধরনা দেয়। ভোরে অর্ধসিদ্ধ ভাত খাইয়া ডেলি-প্যাসেঞ্জার হইয়া সমস্ত দিন অফিসে কলম পিশিয়া বাড়ি ফেরে। এসকল কাজকে সে শ্লাঘ্য বা ভদ্রোচিত মনে করে সেজন্য কষ্ট সহিতে পারে। যেদিন সে বুঝিবে যে বণিগ্‌বৃত্তি হীন নয়, ইহাতে অতি উচ্চ আশা পূরণেরও সম্ভাবনা আছে, সেদিন সে এই বৃত্তির জন্য কোনও কষ্ট গ্রাহ্য করিবে না।

আশার কথা—পূর্বের তুলনায় বাঙালী এখন ব্যবসায়ে অধিকতর মন-

দিতেছে। আজকাল অনেক দেশহিতৈষী কুটীরশিল্প উন্নত কৃষি এবং কার্যকরী শিক্ষা লইয়া আলোচনা করিতেছেন। তাঁহারা যদি বণিগ্‌বৃত্তির উপযোগিতার প্রতি মন দেন তবে অনেক যুবক উৎসাহিত হইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে। বণিগ্‌বৃত্তি সহজেই সংক্রামিত হয়, ইহার ক্ষেত্রও বিশাল। দোকানদার না থাকিলে সমাজ চলে না। জনকতক অগ্রগামীর উদ্যম সফল হইলে তাহাদের দৃষ্টান্তে পরবর্তী অনেকেই সিদ্ধিলাভ করিবে। বাঙালীর বুদ্ধির অভাব নাই, নিপুণতা ও সৌষ্ঠবজ্ঞানও যথেষ্ট আছে। এইসকল সদ্‌গুণ ব্যবসায়ে লাগাইলে প্রতিযোগিতায় সে নিশ্চয় জয়ী হইবে।

বণিগ্‌বৃত্তির প্রসারে বাঙালীর মানসিক অবনতি হইবে না। মসীজীবী বাঙালীর যে সদ্‌গুণ আছে তাহা কলমপেশার ফল নয়। পরদেশী বণিকের যে দোষ আছে তাহাও তাহার বৃত্তিজনিত নয়। অনেক বাঙালী বিদেশী বণিকের গোলামি করিয়াও সাহিত্য ইতিহাস দর্শনের চর্চা করিয়া থাকেন। নিজের দাঁড়িপাল্লা নিজের হাতে ধরিলেই বাঙালীর ভাবের উৎস শুখাইবে না।

রস ও রুচি

(১৩৩৪)

ঋগ্‌বেদের ঋষি আধ-আধ ভাষায় বললেন — 'কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি' — অগ্রে যা উদয় হ'ল তা কাম। তার পর আমাদের আলংকারিকরা নবরসের ফর্দ করতে গিয়ে প্রথমেই বসালেন আদিরস। অবশেষে ফ্রয়েড সদলবলে এসে সাফ সাফ ব'লে দিলেন — মানুষের যাকিছু শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যসৃষ্টি, কমনীয় মনোবৃত্তি, তার অনেকেরই মূলে আছে কামের বহুমুখী প্রেরণা।

সেদিন কোনও মনোবিদ্যার বৈঠকে একটি প্রবন্ধ শুনেছিলাম — রবীন্দ্রনাথের রচনার সাইকোঅ্যানালিসিস। বক্তা পরমশ্রদ্ধাসহকারে রবীন্দ্রসাহিত্যের হাড় মাস চামড়া চিরে চিরে দেখাচ্ছিলেন কবির প্রতিভার মূল উৎস কোথায়। কবি যদি সেই ভৈরবীচক্রে উপস্থিত থাকতেন তবে নিশ্চয় মূর্ছা যেতেন, আর মূর্ছান্তে ছুটে গিয়া কোনও স্মৃতিভূষণকে ধ'রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিতেন।

কি ভয়ানক কথা! আমরা যাকিছু স্পৃহণীয় বরেণ্য পরম উপভোগ্য মনে করি তার অনেকেরই মূলে আছে একটা হীন রিপু! ফ্রয়েডের দল খাতির ক'রে তার নাম দিয়েছেন 'লিবিডো', কিন্তু বস্তুটি লালসারই একটি বিরাট রূপ। তাও কি সোজাসুজি লালসা? তার শতজিহ্বা শতদিকে লকলক করছে, সে দেবতার ভোগ শকুনির উচ্ছিষ্ট একসঙ্গেই চাটতে চায়, তার পাত্রাপাত্র কালাকাল জ্ঞান নেই। এই জঘন্য বৃত্তিই

কি আমাদের রসজ্ঞানের প্রসূতি? 'পাপোহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ'—মনে করতাম এই কথাটি ভগবানকে খুশী করবার জন্য একটু অতিরঞ্জিত বিনয়বচন মাত্র। আমরা যে সত্য সত্যই এমন উৎকট পাপাত্মা তা এতদিন হুঁশ হয় নি। বিধাতা আমাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই নরকস্থ করেছেন, আমাদের আবার সুরুচি কুরুচি!

ছটা রিপুর মধ্যে প্রথমটারই অত প্রতিপত্তি হ'ল কেন? কাব্য সাহিত্য চৌষট্টি-কলা ভক্তি প্রেম স্নেহ সমস্তই কামজ; অতি উত্তম কথা। কিন্তু ক্রোধ থেকে কিছু ভাল জিনিস পাওয়া যায় নি কি? গীতাকার কাম-ক্রোধকে একাকার ক'রে বলেছেন—'কাম এষ, ক্রোধ এষ'। লোভ মোহ প্রভৃতি অন্য রিপুও বোধ হয় তাঁর মতে কামের রূপান্তর। ফ্রয়েডের শিষ্যরা গীতার একটা সরল ব্যাখ্যা লিখলে ভাল হয়।

আর একটা সংশয় আমাদের মতন আনাড়ীদের মনে উদয় হয়।—বৈদিক ঋষি থেকে ফ্রয়েডপন্থী পর্যন্ত সকলেই হয়তো একটা ভুল করেছেন। আগে কাম, না আগে ক্ষুধা? পাচনরসই আদিরস নয়তো? কাম-কমপ্লেক্স্ যেমন নব নব মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে ফুটে ওঠে, ক্ষুৎ-কমপ্লেক্সেরও কি তেমন কোনও ক্ষমতা নেই?

আধুনিক 'মনোজ্ঞ'গণ বলেন—অতৃপ্তি বা নিগ্রহেই কামের রূপান্তর-প্রাপ্তি ঘটে, আর তার ফল এই বিচিত্র মানবচরিত্র। ভোজনেরও অতৃপ্তি আছে, কিন্তু সে অতৃপ্তি তেমন তীব্র নয়, সেজন্য মানুষের মনে তার প্রভাব অল্প। অর্থাৎ উপবাসের চেয়ে বিরহেরই সৃষ্টিশক্তি বেশী। অবশ্য 'বিরহ' শব্দটির একটু ব্যাপক অর্থ ধরতে হবে, ন্যায্য অন্যায্য পবিত্র পাশবিক অস্বাভাবিক সমস্ত অতৃপ্তিই বিরহ, আর তা মনের অগোচরেই কাজ করে।

ক্ষুৎ-কমপ্লেক্সের যে কিছুই সৃষ্টি করবার ক্ষমতা নেই এমন নয়। শোনা যায় সেকালে অনেকে খানা খাবার জন্য ধর্মান্তর গ্রহণ করতেন, অবশ্য তাঁরা অপরকে এবং নিজেকে আধ্যাত্মিক হেতুই দেখাতেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বীকার ক'রে গেছেন তিনি তুচ্ছ পাঁউরুটির লোভে দিনকতক সনাতন সমাজ বর্জন করেছিলেন। এখনকার ভদ্র হিন্দুধর্ম অতি উদার—অন্তত খাওয়া-পরা সম্বন্ধে, সেজন্য লুব্ধ রসনা থেকে মনে আর ধর্মরসের সঞ্চার হয় না। কিন্তু বিবাহে যেটুকু বাধা আছে তা এখনও সমাজে আর উপন্যাসে অঘটন ঘটাচ্ছে।

সাহিত্যে ভোজনরসের প্রতিপত্তি নেই। কালিদাসের যক্ষ শুধু বিরহী নয়, উপবাসীও বটে। সে অলকাপুরীর হরেক রকম ভোগের বর্ণনা করেছে, কিন্তু সেখানকার বাবুর্চীখানার কথা কিছুই বলে নি। রবীন্দ্রনাথও এ রসের প্রতি বিমুখ, কিন্তু তিনি এর প্রভাব একবারে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। কমলার উপর গাজীপুরযাত্রী খুড়োমশায়ের হঠাৎ যে স্নেহ হ'ল তার মূলে কোন্ কমপ্লেক্স্ ছিল? খুড়োর বয়স হয়েছে, কিন্তু ভোজন-ব্যাপারে তিনি উদাসীন নন। স্টীমারে রান্নার সুবাস পেয়ে বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস টেনে বলছেন—'চমৎকার গন্ধ বাহির হইয়াছে'। তরুণ যেমন অচেনা তরুণীর একটু হাসি একটু কাশি একটু হাঁচি অবলম্বন ক'রে ভবিষ্য দাম্পত্য-জীবনের স্বপ্ন রচনা করে, এই বৃদ্ধও তেমনি কমলার ফোড়নের গন্ধে ভবিষ্য ব্যঞ্জনপরম্পরা কল্পনা ক'রে অনাথা মেয়েটির স্নেহে বাঁধা পড়েছিলেন। ফ্রয়েডের শিষ্য নিশ্চয় অন্য ব্যাখ্যা করবেন, কিন্তু আমরা কানে আঙুল দিয়ে রইলাম।

ভোজনরস এখন থাকুক, যে রস মানুষের মনে প্রবলতম তার কথাই হ'ক। কামের পরিবর্তনের ফলে যদি আমরা প্রেম ভক্তি স্নেহ করুণা

কাব্য প্রভৃতি ভাল ভাল জিনিস পেয়ে থাকি, তবে কিসের খেদ? রসগ্রাহী ভদ্রজন ফুল চায়, ফল চায়, গাছের গোড়ায় কিসের সার আছে তার খোঁজ করে না। নীরস বিজ্ঞানী গাছের গোড়া খুঁড়ে দেখুক, সারের ব্যবস্থা করুক, তাতে আপত্তি নেই। পচা জৈব সারে গাছ সতেজ হয়—এটা খাঁটী সত্য কথা। কিন্তু ফুল ফল উপভোগ করবার সময় কেউ তাতে সার মাখায় না।

কিন্তু অতীব লজ্জাসহকারে স্বীকার করতে হবে যে কেবল ফুল ফলে তৃপ্তি হয় না, গাছের গোড়ায় যে জীবনীয় রস আছে তার আস্বাদও আমরা মাঝে মাঝে কামনা করি। সামাজিক জীবনে যা ঘৃণা বা পীড়াদায়ক, এমন অনেক বস্তু নিপুণ রসস্রষ্টার রচিত হ'লে আমরা সমাদরে উপভোগ করি। নতুবা শোক দুঃখ নিষ্ঠুরতা লালসা ব্যাভিচার প্রভৃতির বর্ণনা কাব্যে গল্পে চিত্রে স্থান পেতে না।

আসল কথা—আমাদের বহু কামনা নানা কারণে আমাদের অন্তরের গোপন কোণে নির্বাসিত হয়েছে, এবং তাদের অনেকে উচ্চতর মনোবৃত্তিতে রূপান্তরিত হয়ে হৃদয় ফুঁড়ে বার হয়েছে। এতেই তাদের চরিতার্থতা। এইসকল মনোবৃত্তি সমাজের পক্ষে হিতকর, তাই সমাজ তাদের সযত্নে পোষণ করে, এবং সাহিত্যাদি কলায় তারা অনবদ্য ব'লে গণ্য হয়। কিন্তু যেসব কামনার তেমন রূপান্তরগ্রহের শক্তি নেই তারা মাটিচাপা প'ড়েও অহরহ ঠেলা দিচ্ছে। সমাজ বলছে—খবরদার, যদি ফুটতেই চাও তবে কমনীয় বেশে ফুটে ওঠ। কিন্তু নিগৃহীত কামনা বলছে—ছদ্মবেশে সুখ নেই, আমি স্বমূর্তিতেই প্রকট হ'তে চাই; আমি পাষাণকারা ভাঙব, কিন্তু করুণাধারা ঢালা আমার কাজ নয়। হুশিয়ার রসস্রষ্টা স্নেহশীল পিতার ন্যায় তাদের বলেন—বাপু-সব, তোমাদের একটু রৌদ্রে বেড়িয়ে আনব,

কিন্তু সাজগোজ ক'রে ভদ্রবেশ ধ'রে চল ; আর, বেশী দাপাদাপি ক'রো না। তৃষিত রসজ্ঞজন তাদের দেখে বলেন—আহা, কাদের বাছা তোমরা ? কি সুন্দর, কিন্তু কেউ কেউ যেন একটু বেশী দুরন্ত। তাদের স্রস্টা বুঝিয়ে দেন—এরা তোমার নিতান্তই অন্তরের ধন ; ভয় নেই, এরা কিছুই নষ্ট করবে না, আমি এদের সামলাতে জানি ; এদের মধ্যে যে বেশী দুরন্ত তাকে আমি অবশেষে ঠেঙিয়ে দুরন্ত ক'রে দেব, যে কম দুরন্ত তাকে অনুতপ্ত করব, যে কিছুতেই বাগ মানবে না তাকে নিবিড় রহস্যের জালে জড়িয়ে ছেড়ে দেব। দ্রষ্টার দল খুশী হয়ে বলেন —বাঃ, এই তো আর্ট। কিন্তু দুএকজন অরসিক এত সাবধানতা সত্ত্বেও ভয় পান।

আর একদল রসস্রষ্টা তাঁদের আত্মজের প্রতি অতিমাত্রায় স্নেহশীল। তাঁরা এইসব নিগৃহীত কামনাকে বলেন---কিসের লজ্জা, কিসের ভয় ? অত সাজগোজের দরকার কি, যাও, উলঙ্গ হয়ে রং মেখে নেচে এস। জনকতক লোলুপ রসলিপ্সু তাদের সমাদরে বরণ ক'রে বলছেন— এই তো আসল আর্ট, আদিম ও চরম। কিন্তু সংযমী দ্রষ্টার দল বলেন— কখনও আর্ট নয়, আর্টে আবিলতা থাকতে পারে না ; আর্ট যদি হবে তবে ওদের দেখে আমাদের এতজনের অন্তরে এমন ঘৃণা জন্মায় কেন ? সমাজপতিরা বলেন—আর্ট-ফার্ট বুঝি না ; সমাজের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হ'তে দেব না ; আমাদের সব বিধানই যে ভাল এমন বলি না ; যদি উৎকৃষ্টতর বিধান কিছু দেখাতে পার তো দেখাও ; কিন্তু তা যদি না পার তবে আত্মস্ফূর্তি বা self-expression এর দোহাই দিয়ে যে তোমরা সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করবে, আমাদের ছেলেমেয়ে বিগড়ে দেবে, সেটি হবে না ; আমরা আছি, পুলিসও আছে।

উক্ত দুই দল রসস্রষ্টার মাঝে কোনও গণ্ডি নেই, আছে কেবল মাত্রাভেদ বা সংযমের তারতম্য। ক্ষমতার কথা ধরব না, কারণ অক্ষম শিল্পীর হাতে স্বর্গের চিত্রও নষ্ট হয়, গুণীর হাতে নরকবর্ণনাও হৃদয়গ্রাহী হয়। কোন্ সীমায় সুরুচির শেষ আর কুরুচির আরম্ভ তারও নির্ধারণ হ'তে পারে না। এক যুগ এক দল যাকে উত্তম আর্ট বলবে, অপর যুগ অপর দল তার নিন্দা করবে, আর সমাজ চিরকালই আর্ট সম্বন্ধে অনধিকারচর্চা করবে।

বিধাতার রচনা জগৎ, মানুষের রচনা আর্ট। বিধাতা একা, তাই তাঁর সৃষ্টিতে আমরা নিয়মের রাজত্ব দেখি। মানুষ অনেক, তাই তার সৃষ্টি নিয়ে এত বিতণ্ডা। এই সৃষ্টির বীজ মানুষের মনে নিহিত আছে, তাই বোধ হয় প্রতীচ্য মনোবিদের 'লিবিডো' আর ঋষিপ্রোক্ত 'কাম'—

কামস্তদগ্রে সমবর্তাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ
সতো বংধুমসতি নিরবিংদন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা।
(ঋগ্‌বেদ, ১০ম. ১২৯ সূ)

কামনার হ'ল উদয় অগ্রে, যা হ'ল প্রথম মনের বীজ।
মনীষী কবিরা পর্যালোচনা করিয়া করিয়া হৃদয় নিজ
নিরূপিলা সবে মনীষার বলে উভয়ের সংযোগের ভাব,
অসৎ হইতে হইল কেমনে সতের প্রথম আবির্ভাব।
(শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা কৃত অনুবাদ)

ঋষি অবশ্য বিশ্বসৃষ্টির কথাই বলছেন, এবং 'সৎ' ও 'অসৎ' শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থই ধরতে হবে। কিন্তু সৎ-অসৎ-এর বাংলা অর্থ ধরলে এই সূক্তটি আর্ট সম্বন্ধেও প্রয়োজ্য। ফ্রয়েডপন্থীর সিদ্ধান্ত অনুসারে অসদ্‌বস্তু কাম থেকে সদ্‌বস্তু আর্ট উৎপন্ন হয়েছে। মনীষী কবিরা নিজ-

-হৃদয় পর্যালোচনা ক'রে হয়তো আপন অন্তরে আর্টের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু জনসাধারণের উপলব্ধি এখনও অস্ফুট। কি আর্ট, আর কি আর্ট নয়—বিজ্ঞান আজও নিরূপিত করতে পারে নি, অতএব সুরুচি কুরুচি সুনীতি দুর্নীতির বিবাদ আপাতত চলবেই। যদি কোনও কালে আর্টের লক্ষণ নির্ধারিত হয়, তাহ'লেও সমাজের শঙ্কা দূর হবে কিনা সন্দেহ।

রস কি তা আমরা বুঝি কিন্তু বোঝাতে পারি না। আর্টের প্রধান উপাদান রস, কিন্তু তার অন্য অঙ্গও আছে তাই আর্ট আরও জটিল। চিনি বিশুদ্ধ রসবস্তু, কিন্তু শুধু চিনি তুচ্ছ আর্ট। চিনির সঙ্গে অন্যান্য রসবস্তুর নিপুণ মিলনই আর্ট। কিন্তু যেসব উপাদান আমরা হাতের কাছে পাই তার সবগুলি অখণ্ড রসবস্তু নয়, অল্পবিস্তর অবান্তর খাদ আছে। নির্বাচনের দোষে মাত্রাজ্ঞানের অভাবে অতিরিক্ত বাজে উপাদান এসে পড়ে, অভীষ্ট স্বাদে অবাঞ্ছিত স্বাদ জন্মায়। তার উপর আবার ভোক্তার পূর্ব অভ্যাস আছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা আছে, ব্যক্তি-গত রাগদ্বেষ আছে। এত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে, ভোক্তার রুচি গঠিত ক'রে, কল্যাণের অন্তরায় না হয়ে, যাঁর সৃষ্টি স্থায়ী হবে, তিনিই শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা।

অপবিজ্ঞান

(১৩৩৬)

বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের ফলে প্রাচীন অন্ধসংস্কার ক্রমশ দূর হইতেছে ; কিন্তু যাহা যাইতেছে তাহার স্থানে নূতন জঞ্জাল কিছু কিছু জমিতেছে। ধর্মের বুলি লইয়া যেমন অপধর্ম সৃষ্ট হয়, তেমনি বিজ্ঞানের বুলি লইয়া অপবিজ্ঞান গড়িয়া উঠে। সকল দেশেই বিজ্ঞানের নামে অনেক নূতন ভ্রান্তি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ছদ্মবেশে যেসকল ভ্রান্ত ধারণা এদেশে লোকপ্রিয় হইয়াছে, তাহারই কয়েকটির কথা বলিতেছি।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য — বিদ্যুৎ। তীব্র উপহাসের ফলে এই শব্দটির প্রয়োগে আজকাল কিঞ্চিৎ সংযম আসিয়াছে। টিকিতে বিদ্যুৎ, পইতায় বিদ্যুৎ, গঙ্গাজলে বিদ্যুৎ — এখন বড় একটা শোনা যায় না। গল্প শুনিয়াছি, এক সভায় পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি অগস্ত্যমুনির সমুদ্রশোষণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। অগস্ত্যের ক্রুদ্ধ চক্ষু হইতে এমন প্রচণ্ড বিদ্যুৎস্রোত নির্গত হইল যে সমস্ত সমুদ্রের জল এক নিমেষে বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন অক্সিজেন রূপে উবিয়া গেল। সকলে অবাক হইয়া এই ব্যাখ্যা শুনিল, কেবল একজন ধৃষ্ট শ্রোতা বলিল — 'আরে না মশায়, আপনি জানেন না, চোঁ ক'রে মেরে দিয়েছিল'।

বিদ্যুতের মহিমা কমিলেও একবারে লোপ পায় নাই। কিছুদিন

পূর্বে কোনও মাসিক পত্রিকায় এক কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছিলেন —'সর্বদাই মনে রাখিবেন তুলসীগাছের সর্বত্র নিরন্তর বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত হইতেছে'। এই অপূর্ব তথ্যটি তিনি কোথায় পাইলেন, চরকে কি সুশ্রুতে কিংবা নিজ মনের অন্তস্তলে, তাহা বলেন নাই। বৈদ্যুতিক সালসা বৈদ্যুতিক আংটি বাজারে সুপ্রচলিত। অষ্টধাতুর মাদুলির গুণ এখন আর শাস্ত্র বা প্রবাদের উপর নির্ভর করে না। ব্যাটারিতে দুই রকম ধাতু থাকে বলিয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, অতএব অষ্টধাতুর উপযোগিতা আরও বেশী না হইবে কেন! বিলাতী খবরের কাগজেও বৈদ্যুতিক কোমরবন্ধের বিজ্ঞাপন সায় প্রশংসাপত্র বাহির হইতেছে। সাহেবরা ঠকাইবার বা ঠকিবার পাত্র নয়, অতএব তোমার আমার অশ্রদ্ধার কোনও হেতু নাই। মোট কথা, সাধারণের বিশ্বাস — মিছরি নিম এবং ভাইটামিনের তুল্য বিদ্যুৎ একটি উৎকৃষ্ট পথ্য, যেমন করিয়া হউক দেহে সঞ্চারিত করিলেই উপকার। বিদ্যুৎ কি করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার প্রকার ও মাত্রা আছে কিনা, কোন্ রোগে কি রকমে প্রয়োগ করিতে হয়, এত কথা কেহ ভাবে না। আমার পরিচিত এক মালীর হাতে বাত হইয়াছিল। কে তাহাকে বলিয়াছিল বিজলীতে বাত সারে এবং টেলিগ্রাফের তারে বিজলী আছে। মালী এক টুকরা ঐ তার সংগ্রহ করিয়া হাতে তাগা পরিয়াছিল।

উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া শুইতে নাই, শাস্ত্রে বারণ আছে। শাস্ত্র কারণ নির্দেশ করে না, সুতারাং বিজ্ঞানকে সাক্ষী মানা হইয়াছে। পৃথিবী একটি প্রকাণ্ড চুম্বক, মানুষের দেহও নাকি চুম্বকধর্মী। অতএব উত্তরমেরুর দিকে মাথা না রাখাই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু দক্ষিণমেরু নিরাপদ কেন হইল তাহার কারণ কেহ দেন নাই।

জোনাকিপোকা প্রদীপে পুড়িলে যে ধুঁয়া বাহির হয় তাহা অত্যন্ত বিষ এই প্রবাদ বহুপ্রচলিত। অপবিজ্ঞান বলে — জোনাকি হইতে আলোক বাহির হয় অতএব তাহাতে প্রচুর ফসফরস আছে, এবং ফসফরসের ধুঁয়া মারাত্মক বিষ। প্রকৃত কথা — ফসফরস যখন মৌলিক অবস্থায় থাকে তখন বায়ুর স্পর্শে তাহা হইতে আলোক বাহির হয়, এবং ফসফরস বিষও বটে। কিন্তু জোনাকির আলোক ফসফরস-জনিত নয়। প্রাণিদেহ মাত্রেই কিঞ্চিৎ ফসফরস আছে, কিন্তু তাহা যৌগিক অবস্থায় আছে, এবং তাহাতে বিষধর্ম নাই। এক টুকরা মাছে যত ফসফরস আছে, একটি জোনাকিতে তাহার অপেক্ষা অনেক কম আছে। মাছ-পোড়া যেমন নিরাপদ, জোনাকি-পোড়াও তেমন।

কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক নামের একটা মোহিনী শক্তি আছে, লোকে সেই নাম শিখিলে স্থানে অস্থানে প্রয়োগ করে। 'গাটাপার্চা' এইরকম একটি মুখরোচক শব্দ। ফাউন্টেন পেন চিরুনি চশমার ফ্রেম প্রভৃতি বহু বস্তুর উপাদানকে লোকে নির্বিচারে গাটাপার্চা বলে। গাটাপার্চা রবারের ন্যায় বৃক্ষবিশেষের নিষ্যন্দ। ইহাতে বৈদ্যুতিক তারের আবরণ হয়, জলরোধক বার্নিশ হয়, ডাক্তারী চিকিৎসায় ইহার পাত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাধারণত লোকে যাহাকে গাটাপার্চা বলে তাহা অন্য বস্তু। আজকাল যেসকল শৃঙ্গবৎ কৃত্রিম পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে তাহার কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।—

নাইট্রিক অ্যাসিড তুলা ইত্যাদি হইতে সেলিউলয়েড হয়। ইহা কাচতুল্য স্বচ্ছ, কিন্তু অন্য উপাদান যোগে রঞ্জিত চিত্রিত বা হাতির দাঁতের ন্যায় সাদা করা যায়। ফোটোগ্রাফের ফিল্ম, মোটর গাড়ির

জানালা, হার্মোনিয়মের চাবি, পুতুল, চিরুনি, বোতাম প্রভৃতি অনেক জিনিসের উপাদান সেলিউলয়েড। অনেক চশমার ফ্রেমও এই পদার্থ।

রবারের সহিত গন্ধক মিলাইয়া ইবনাইট বা ভল্‌কানাইট প্রস্তুত হয়। বাংলায় ইহাকে 'কাচকড়া' বলা হয়, যদিও কাচকড়ার মূল অর্থ কাছিমের খোলা। ইবনাইট স্বচ্ছ নয়। ইহা হইতে ফাউণ্টেন পেন চিরুনি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

আরও নানাজাতীয় স্বচ্ছ বা শৃঙ্গবৎ পদার্থ বিভিন্ন নামে বাজারে চলিতেছে, যথা—সেলোফেন, ভিসকোজ, গ্যালালিথ, ব্যাকেলাইট ইত্যাদি। এগুলির উপাদান ও প্রস্তুতপ্রণালী বিভিন্ন। নকল রেশম, নকল হাতির দাঁত, নানারকম বার্নিশ, বোতাম, চিরুনি প্রভৃতি বহু শৌখিন জিনিস ঐসকল পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয়।

বঙ্গভঙ্গের সময় যখন মেয়েরা কাচের চুড়ি বর্জন করিলেন তখন একটি অপূর্ব স্বদেশী পণ্য দেখা দিয়াছিল—'আলুর চুড়ি'। ইহা বিলাতী সেলিউলয়েডের পাত জুড়িয়া প্রস্তুত। আলুর সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। বিলাতী সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে অতিরঞ্জিত আজগবী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের খবর বাহির হয়। বহুকালপূর্বে কোনও কাগজে পড়িয়াছিলাম গন্ধকাম্লে আলু ভিজাইয়া কৃত্রিম হস্তিদন্ত প্রস্তুত হইতেছে। বোধ হয় তাহা হইতেই আলুর চুড়ি নামটি রটিয়াছিল।

আর একটি ভ্রান্তিকর নাম সম্প্রতি সৃষ্টি হইয়াছে—'আলপাকা শাড়ি'। আলপাকা একপ্রকার পশমী কাপড়। কিন্তু আলপাকা শাড়িতে পশমের লেশ নাই, ইহা কৃত্রিম রেশম হইতে প্রস্তুত।

টিন শব্দের অপপ্রয়োগ আমরা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছি। ইহার প্রকৃত অর্থ রাং, ইংরেজীতে তাহাই মুখ্য অর্থ। কিন্তু আর এক অর্থ—

রাংএর লেপ দেওয়া লোহার পাত অথবা তাহা হইতে প্রস্তুত আধার, যথা 'কেরোসিনের টিন'। ঘর ছাহিবার করুগেটেড লোহায় দস্তার লেপ থাকে। তাহাও 'টিন' আখ্যা পাইয়াছে, যথা 'টিনের ছাদ'।

আজকাল মনোবিদ্যার উপর শিক্ষিত জনের প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছে, তাহার ফলে এই বিদ্যার বুলি সর্বত্র শোনা যাইতেছে। Psychological moment কথাটি বহুদিন হইতে সংবাদপত্র ও বক্তৃতার অপরিহার্য বুকনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি আর একটি শব্দ চলিতেছে—complex। অমুক লোক ভীরু বা অন্যের অনুগত, অতএব তাহার inferiority complex আছে। অমুক লোক সাঁতার দিতে ভালবাসে, অতএব তাহার water complex আছে। বিজ্ঞানীর দুর্ভাগ্য—তিনি মাথা ঘামাইয়া যে পরিভাষা রচনা করেন সাধারণে তাহা কাড়িয়া লইয়া অপপ্রয়োগ করে, এবং অবশেষে একটা বিকৃত কদর্থ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া বিজ্ঞানীকে স্বাধিকারচ্যুত করে।

মানুষের কৌতূহলের সীমা নাই, সব ব্যাপারেরই সে কারণ জানিতে চায়। কিন্তু তাহার আত্মপ্রতারণার প্রবৃত্তিও অসাধারণ, তাই সে প্রমাদকে প্রমাণ মনে করে, বাক্‌ছলকে হেতু মনে করে। বাংলা মাসিকপত্রিকার জিজ্ঞাসাবিভাগের লেখকগণ অনেক সময় হাস্যকর অপবিজ্ঞানের অবতারণা করেন। কেহ প্রশ্ন করেন—বাতাস করিতে করিতে গায়ে পাখা ঠেকিলে তাহা মাটিতে ঠুকিতে হয়, ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি। কেহ বা গ্রহণে হাঁড়ি ফেলার বৈজ্ঞানিক কারণ জানিতে চান। উত্তর যাহা আসে তাহাও চমৎকার। কিছুদিন পূর্ব 'প্রবাসী'র জিজ্ঞাসাবিভাগে একজন প্রশ্ন করিয়াছিলেন মাছির মল হইতে পুদিনা গাছ জন্মায় ইহা সত্য কিনা। একাধিক ব্যক্তি উত্তর দিলেন—অলবৎ

পারে—অদৃষ্টবাদ বা নিয়তিবাদ। ইহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দান নয়, নিতান্তই ভারতীয় বস্তু। আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত ইহার বিবাদ নাই, কিন্তু সাধারণ লোকে যে অদৃষ্টবাদের আশ্রয় লয় তাহা অপবিজ্ঞান মাত্র।

বহুযুগের অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের দূরদৃষ্টি জন্মিয়াছে, অতীত ও ভবিষ্যৎ অনেক ব্যাপারপরম্পরা সে নির্ণয় করিতে পারে। কিসে কি হয় মানুষ অনেকটা জানে এবং সেই জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা প্রয়োজন সাধন করে। কতকগুলি জাগতিক ব্যাপার আমাদের বোধ্য বা সাধ্য, কিন্তু অধিকাংশই অবোধ্য বা অসাধ্য। প্রথমোক্ত বিষয়গুলি আমাদের 'দৃষ্ট' অর্থাৎ নির্ণেয় শেষোক্ত বিষয়গুলি 'অদৃষ্ট' অর্থাৎ অনির্ণেয়। যাহা দৃষ্ট তাহাতে আমাদের কিছু হাত আছে, যাহা অদৃষ্ট তাহাতে মোটেই হাত নাই।

নিয়তিবাদী দার্শনিক বলেন—কিসে কি হইবে তাহা জগতের উৎপত্তির সঙ্গেই নিয়মিত হইয়া আছে, সমস্ত ব্যাপারই নিয়তি। মানুষের সাধ্য অসাধ্য সমস্তই নিয়তি, আমরা নিয়তি অনুসারেই পুরুষকার প্রয়োগ করি। কাজ সহজে উদ্ধার হইয়া গেলে নিয়তির কথা মনে আসে না। কিন্তু চেষ্টা বিফল হইলেই মনে পড়ে, নিয়তি মানুষের অবাধ্য, যত্ন করিলেও সব কাজ সিদ্ধ হয় না।

বিজ্ঞানও স্বীকার করে—এই জগৎ নিয়তির রাজ্য, সমস্ত ঘটনা কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত এবং অখণ্ডনীয়রূপে নিয়ন্ত্রিত। অভিজ্ঞ ব্যক্তি কোনও কোনও বিষয়ের ভবিষ্যদ্‌উক্তি করিতে পারেন, যথা—অমুক দিন চন্দ্রগ্রহণ হইবে, অমুক লোকের শীঘ্র জেল হইবে। প্রাকৃতিক নিয়ম বা নিয়তির কিয়দংশ তাঁহার জানা আছে বলিয়াই পারেন। বিচক্ষণ দাবা-খেলোয়াড় ভবিষ্যতের পাঁচ ছয় চাল হিসাব করিয়া ঘুঁটি চালিয়া থাকে।

কিন্তু যাহা মানুষের প্রতর্ক্য বা অনুমানগম্য তাহা সকল ক্ষেত্রে সাধ্য বা প্রতিকার্য নয়। আমাদের এমন শক্তি নাই যে চন্দ্রের গ্রহণ রোধ করি, কিন্তু এমন শক্তি থাকিতে পারে যাহাতে অমুকের কারাদণ্ড নিবারণ করা যায়। এমন প্রাজ্ঞ যদি কেহ থাকেন যিনি সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম জানেন, তবে তিনি সর্বদ্রষ্টা ত্রিকালজ্ঞ। তাঁহার কাছে নিয়তি 'অদৃষ্ট' নয়, দৃষ্ট ও স্পষ্ট। তিনি মানুষ, তাই সর্বশক্তিমান হইতে পারেন না, কিন্তু অন্য মানুষের তুলনায় তাঁহার সাধ্যের সীমা অতি বৃহৎ। জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে মানবসমাজ এইরূপে উত্তরোত্তর অনাগতবিধাতা হইতেছে।

কূট তার্কিক বলিবেন — প্রকৃতির অখণ্ডনীয় বিধি মানিব কেন? তোমার আমার বুদ্ধিতে ফল মাটিতে পড়ে, যথাকালে চন্দ্রগ্রহণ হয়, দুই আর তিনে পাঁচ হয়। কিন্তু এমন ভুবন বা এমন অবস্থা থাকিতে পারে যেখানে বিধির ব্যতিক্রম হয়। বিজ্ঞানী উত্তর দেন — তোমার সংশয় যথার্থ। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এই চিরপরিচিত ভুবন এবং তোমার আমার তুল্য প্রকৃতিস্থ মানুষের দৃষ্টি। যখন অন্য ভুবনে যাইব বা অন্য প্রকার দেখিব তখন অন্য বিজ্ঞান রচনা করিব। বিজ্ঞানী যে সূত্র প্রণয়ন করেন তাহা কখনও কখনও সংশোধন করিতে হয় সত্য; কিন্তু তাহা প্রাকৃতিক বিধির পরিবর্তনের ফলে নয়।

অতএব, অদৃষ্টের অর্থ—অনির্ণেয় ও অসাধ্য ঘটনাসমূহ; নিয়তির অর্থ—সমস্ত ঘটনার অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ বা আনুপূর্ব। ঘটনার কারণ অদৃষ্ট বা নিয়তি নয়। কিন্তু সাধারণ লোকে অদৃষ্টকে অনর্থক টানিয়া আনিয়া সুখদুঃখের ব্যাখ্যা করে। জীবনযাত্রা যখন নিরুদ্বেগে চলিয়া যায় তখন কারণ জানিবার ঔৎসুক্য থাকে না। কিন্তু যদি একটা বিপদ ঘটে, কিংবা যদি কোন পরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ বড়লোক হয়, তখনই মনে

কষ্টকর প্রশ্ন আসে—কেন এমন হইল ? বিজ্ঞলোক ব্যাখ্যা করেন—বাপু, কেন হইল সেটা বুঝিলে না ? সমস্তই অদৃষ্ট, কপাল, ভাগ্য, নিয়তি। অমুক লোকটি মরিল কেন, ইহার উত্তরে যদি বলা হয়—কলেরা, সর্পাঘাত, অনেক বয়স—তবে একটা কারণ বুঝা যায়। কিন্তু ইহা বলা বৃথা—মরণের অনির্দেয়তা বা অবার্যতাই মরিবার কারণ। অথচ, 'অদৃষ্ট' বলিলে ইহাই বলা হয়। যাহা অবিসংবাদিত সত্য বা truism তাহা শুনিলে কাহারও কৌতূহলনিবৃত্তি বা সান্ত্বনালাভ হয় না, সুতরাং ইহাও বলা বৃথা—অমুক লোকটি ঘটনাপরম্পরার ফলে মরিয়াছে। অথচ, 'নিয়তি' বলিলে ইহাই বলা হয়। 'অদৃষ্ট' ও 'নিয়তি' শব্দ সাধারণের নিকট প্রকৃত অর্থ হারাইয়াছে এবং বিধাতার আসন পাইয়া সুখদুঃখের নিগূঢ় কারণ রূপে গণ্য হইতেছে।

অধ্যাপক Poyintingএর এই উক্তিটি উদ্ধারযোগ্য।—

'No long time ago physical laws were quite commonly described as the Fixed Laws of Nature, and were supposed sufficient in themselves to govern the universe...A law of nature explains nothing—it has no governing power, it is but a descriptive formula which the careless has sometimes personified.'

ঘনীকৃত তৈল

(১৩৩৭)

চলিত কথায় 'তৈল' বলিলে যেসকল বস্তু বুঝায় তাহাদের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়। সকল তৈলই দাহ্য, অল্পাধিক তরল এবং জলে অদ্রাব্য। তার্পিন কেরোসিন ও সর্ষপ তৈলে এইসকল লক্ষণ বর্তমান। পক্ষান্তরে স্পিরিট তৈল নয়, কারণ তাহা দাহ্য ও তরল হইলেও জলের সহিত মিশে।

কিন্তু তার্পিন কেরোসিন ও সর্ষপ তৈলের কতকগুলি প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে। তার্পিন সহজে উবিয়া যায়, কেরোসিন উবিতে সময় লাগে, সর্ষপ তৈল মোটেই উবে না। সর্ষপ তৈলের সহিত সোডা মিশাইয়া সাবান করা যায়, কিন্তু তার্পিন ও কেরোসিনে সাবান হয় না।

আমরা মোটামুটি কাজ চালাইবার জন্য পদার্থের স্থূল লক্ষণ দেখিয়া শ্রেণীবিভাগ করি, কিন্তু বিজ্ঞানী তাহাতে সন্তুষ্ট নন। তাঁহারা নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখেন কোন্ লক্ষণগুলি পদার্থের গঠন ও ক্রিয়ার পরিচায়ক, এবং সেইগুলিকেই মুখ্য লক্ষণ গণ্য করিয়া শ্রেণীবিভাগ করেন। শ্রেণীনির্দেশের জন্য বিজ্ঞানী নূতন নাম রচনা করেন, অথবা প্রচলিত নাম বজায় রাখিয়া তাহার অর্থ সংকুচিত বা প্রসারিত করেন। এজন্য লৌকিক ও বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগে অনেক স্থলে বিরোধ দেখা যায়। লোকে বলে চিংড়ি-মাছ, বিজ্ঞানী বলেন চিংড়ি মাছ নয়। লোকে কয়েকপ্রকার লবণ জানে, যথা—সৈন্ধব, করকচ, লিভারপুল,

বেআইনী, ইত্যাদি। বিজ্ঞানী বলেন, লবণ তোমার রান্নাঘরের একচেটে নয়, লবণ অসংখ্য, ফটকিরি তুঁতেও লবণ। কবি লেখেন—তাল-তমাল। বিজ্ঞানী বলেন—ও দুই গাছে ঢের তফাত, বরং ঘাস-বাঁশ লিখিতে পার।

রসায়নশাস্ত্র অনুসারে তার্পিন কেরোসিন ও সর্ষপ তৈল তিন পৃথক শ্রেণীতে পড়ে। তার্পিন, চন্দন, নেবুর তৈল প্রভৃতি গন্ধতৈল প্রথম শ্রেণী। কেরোসিন, পেট্রল, ভ্যাসেলিন, এমন কি কঠিন প্যারাফিন—যাহা হইতে বর্মা-বাতি হয়, দ্বিতীয় শ্রেণী। সর্ষপ তৈল, তিল তৈল, ঘৃত, চর্বি প্রভৃতি উদ্‌ভিজ্জ ও প্রাণিজ স্নেহদ্রব্য তৃতীয় শ্রেণী। তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ ইংরেজী নাম fat ; আমরা এই শ্রেণীকেই 'তৈল' নামে অভিহিত করিব। অপর দুই শ্রেণী এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নয়।

তৈল মানুষের খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান। ভারতের প্রদেশভেদে সর্ষপ তিল চীনাবাদাম ও নারিকেল তৈল রন্ধনে ব্যবহৃত হয়। ঘৃতের তো কথাই নাই, ভারতবাসী মাত্রই ঘৃতভক্ত। চর্বির ভক্তও অনেক আছে। কার্পাসবীজের তৈলও আজকাল রন্ধনে চলিতেছে। কোনও কোনও স্থানে তিসির তৈলও বাদ যায় না। মাদ্রাজে রেড়ির তৈলে প্রস্তুত উপাদেয় আমের আচার খাইয়াছি।

সাধারণ সাবানের উপাদান তৈল ও সোডা। তৈলভেদে সাবানের গুণের তারতম্য হয়। চর্বি ও নারিকেল তৈলের সাবান শক্ত, রেড়ি তিল চীনাবাদাম প্রভৃতি তৈলের সাবান নরম। লোকে নরম সাবান পছন্দ করে না, সেজন্য অন্য তৈলের সহিত কিছু চর্বি ও নারিকেল তৈল মিশানো হয়। নারিকেল তৈলের বিশেষ গুণ—সাবানে প্রচুর ফেনা হয়। কোনও কোনও কাজে নরম সাবানই দরকার হয়, সেজন্য নারিকেল তৈল ও চর্বি না দিয়া অন্য উদ্‌ভিজ্জ তৈল বা মাছের তৈল

ব্যবহার করা হয় এবং সোডার বদলে অল্পাধিক পটাশ দেওয়া হয়। কিন্তু মোটের উপর কঠিন সাবানেরই আদর বেশী সেজন্য চর্বি ও নারিকেল তৈলের কাটতি ক্রমে বাড়িতেছে।

কলের তাঁতে বুনিবার পূর্বে সুতায় যে মাড় দেওয়া হয় তাহার একটি প্রধান উপকরণ চর্বি। আমাদের দেশের তাঁতীরা নারিকেল তৈল দেয়, কিন্তু মিলে চর্বিই প্রকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। এই কারণেও চর্বির মূল্যবৃদ্ধি হইতেছে।

লুচি কচুরি প্রস্তুত করিবার সময় ময়দায় ঘিএর ময়ান দেওয়া হয়, তাহার ফলে খাবার খাস্তা হয়, অর্থাৎ ময়দাপিণ্ডের চিমসা ভাব দূর হয়। খাজা, ঢাকাই পরটা প্রভৃতিতে প্রচুর ময়ান থাকে, সেজন্য ভাজিবার সময় স্তরে স্তরে আলগা হইয়া যায়। কিন্তু যদি ঘিএর বদলে তেলের ময়ান দেওয়া হয় তবে তত ভাল হয় না। চর্বি দিলে ঘিএর চেয়েও ভাল হয়, অবশ্য সকলে সে পরীক্ষা করিতে রাজী হইবে না। বিলাতী বিস্কুটে এযাবৎ চর্বির ময়ান চলিয়া আসিতেছে। এদেশে যে 'হিন্দুবিস্কুট' প্রস্তুত হয় তাহা বিলাতীর সমকক্ষ নয়। ইহার প্রধান কারণ—নিপুণতার অভাব, কিন্তু চর্বির বদলে ঘি বা মাখন ব্যবহারও অন্যতম কারণ।

তৈল চর্বি ইত্যাদির যতরকম প্রয়োগ আছে তাহার বর্ণনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এখন ঘনীকৃত তৈলের কথা পাড়িব।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে একজন ফরাসী রসায়নবিৎ আবিষ্কার করেন যে নিকেল-ধাতুর সূক্ষ্ম চূর্ণের সাহায্যে তৈলের সহিত হাইড্রোজেন গ্যাস যোগ করা যায়, তাহার ফলে তরল তৈল ঘনীভূত হয়। এই প্রক্রিয়ায় নিকেল্ অনুঘটকের (catalyst) কাজ করে মাত্র, উৎপন্ন বস্তুর অঙ্গীভূত হয় না। উক্ত আবিষ্কারের পর বহু বিজ্ঞানী এই প্রক্রিয়ার উত্তরোত্তর

উন্নতিসাধন করিয়াছেন, তাহার ফলে একটি বিশাল ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

যে-কোনও তৈল এই উপায়ে রূপান্তরিত করিতে পারা যায়। হাইড্রোজেনের মাত্রা অনুসারে ঘৃতের তুল্য কোমল, চর্বির তুল্য ঘন, মোমের তুল্য কঠিন অথবা তদপেক্ষাও কঠিন বস্তু উৎপন্ন হয়। সর্ষপ তৈল, নিম তৈল, এমন কি পূতিগন্ধ মাছের তৈল পর্যন্ত বর্ণহীন গন্ধহীন ঘন বস্তুতে পরিণত হয়।

Hydrogenated oil বা solidified oil বা ঘনীকৃত তৈল এখন ইওরোপ ও আমেরিকার নানা স্থানে প্রস্তুত হইতেছে। এই ব্যবসায়ে হলাণ্ড মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ইংলাণ্ডও ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে। এতদিন চর্বি দ্বারা যে কাজ হইত এখন বহুস্থলে ঘনীকৃত তৈল দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইতেছে। যেসকল উদ্‌ভিজ্জ ও প্রাণিজ তৈল পূর্বে অতি নিকৃষ্ট ও অব্যবহার্য বলিয়া গণ্য হইত, এখন তাহাদেরও সদ্‌গতি হইতেছে।

রুটি-মাখন বিলাতের জনপ্রিয় খাদ্য। কিন্তু গরিব লোকে মাখনের খরচ যোগাইতে পারে না, সেজন্য 'মারগারিন' নামক কৃত্রিম মাখনের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্বে ইহার উপাদান ছিল—চর্বি, উদ্‌ভিজ্জ তৈল, কিঞ্চিৎ দুগ্ধ এবং ঈষৎ মাত্রায় পিষ্ট-গোস্তনের নির্যাস। শেষোক্ত উপাদান মিশ্রণের ফলে মারগারিনে মাখনের স্বাদ ও গন্ধ কিয়ৎপরিমাণে উৎপন্ন হয়। ভাল মারগারিনে কিছু খাঁটী মাখনও মিশ্রিত থাকে। আজকাল যে মারগারিন প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে চর্বি ও স্বাভাবিক উদ্‌ভিজ্জ তৈল প্রায় থাকে না, তৎপরিবর্তে মাখনের তুল্য ঘনীকৃত তৈল দেওয়া হয়, কিন্তু অন্যান্য উপাদান পূর্ববৎ বজায় আছে। চকোলেট টফি প্রভৃতি

খাদ্যে পূর্বে মাখন দেওয়া হইত, এখন প্রায় ঘনীকৃত তৈল দেওয়া হইতেছে, তাহার ফলে লাভ বাড়িয়াছে এবং বিকৃতির আশঙ্কাও কমিয়াছে। বিস্কুটেও ক্রমশ চর্বির বদলে ঘনীকৃত তৈল চলিতেছে, সেজন্য কোনও কোনও ব্যবসায়ী সগর্বে বলিতেছেন—তাঁহাদের জিনিস খাইলে হিন্দু-মুসলমানের জাতি যায় না। সাবান ও অন্যান্য বহু ব্যবসায়ে ঘনীকৃত তৈলের প্রয়োগ ক্রমশ প্রসারিত হইতেছে। মোট কথা, বিশেষ বিশেষ কর্মের উপযুক্ত অনেকপ্রকার ঘনীকৃত তৈল প্রস্তুত হইতেছে এবং লোকেও তাহার প্রয়োগ শিখিতেছে।

এই নূতন বস্তুর ব্যবহার কয়েক বৎসর পূর্বে ইওরোপ ও আমেরিকাতেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু উৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়িগণ নব নব ক্ষেত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অচিরে দৃষ্টি পড়িল এই দেশের উপর। ভারতগাভী সর্বদা হাঁ করিয়া আছে, বিলাতী বণিক যাহা মুখে গুঁজিয়া দিবে তাহাই নির্বিচারে গিলিবে এবং দাতার ভাণ্ড দুগ্ধে ভরিয়া দিবে। অতএব বিশেষ করিয়া এই দেশের জন্য এক অভিনব বস্তু সৃষ্ট হইল—'vegetable product' বা 'উদ্‌ভিজ্জ পদার্থ'। ব্যবসায়িগণ প্রচার করিলেন—ইহাতে স্বাস্থ্যহানি হয় না, ধর্মহানি হয় না, এবং পবিত্রতার নিদর্শনস্বরূপ ইহার মার্কা দিলেন—বনস্পতি বা পদ্মকোরক বা নবকিশলয়। ভারতের জঠরাগ্নি এই বিজ্ঞানসম্ভূত হবির আহুতি পাইয়া পরিতৃপ্ত হইল, হালুইকর ও হোটেলওয়ালা মহানন্দে স্বাহা বলিল, দরিদ্র গৃহস্থবধূ লুচি ভাজিয়া কৃতার্থ হইল। দেশের সর্বত্র এই বস্তু ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হইতেছে এবং শীঘ্রই পল্লীর ঘরে ঘরে কেরোসিন তৈলের ন্যায় বিরাজ করিবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আজকাল বহুস্থলে ভোজের রন্ধনে ঘৃতের সহিত আধাআধি ইহা চলিতেছে। ধর্মভীরু

ঘিওয়ালার কুণ্ঠা দূর হইয়াছে, এখন আর চর্বি ভেজাল দিবার দরকার হয় না, বনস্পতি-মার্কা মিশাইলেই চলে। সুদূর পল্লীতে অনেক গোয়ালার ঘরে খোঁজ করিলে এই জিনিসের টিন মিলিবে। ঘি ভেজালের প্রথম পর্ব এখন গোয়ালার ঘরেই নিষ্পন্ন হয়।

কিন্তু এত গুণ এত সুবিধা সত্ত্বেও এই দ্রব্যের বিরুদ্ধে কয়েকজন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনে এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক কাউনসিলে এ সম্বন্ধে বহু বিতর্ক হইয়া গিয়াছে, অবশ্য তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। ঘনীকৃত তৈলের সপক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল যুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহার মর্ম এই।—

সপক্ষ বলেন—খাঁটী ঘি নিশ্চয়ই খুব ভাল জিনিস, তাহার সহিত আমরা প্রতিযোগিতা করিতেছি না। কিন্তু সকলের ঘি খাইবার সংগতি নাই। অনেক খাদ্যদ্রব্য আছে যাহা তেল দিয়া তৈয়ারি করিলে ভাল হয় না, যথা লুচি, কচুরি, গজা, মিঠাই, চপ। এইসকল দ্রব্য ভাজিবার জন্য বাজারের ভেজাল ঘিএর বদলে অপেক্ষাকৃত সস্তা অথচ নির্দোষ ঘনীকৃত তৈল ব্যবহার করিবে না কেন? ইহাতে ভাল ঘিএর সুগন্ধ নাই সত্য, কিন্তু দুর্গন্ধও নাই, এমন কি কোনও গন্ধই নাই। ইহাতে খাবার ভাজিলে তেলে-ভাজা বলিয়া বোধ হয় না, বরং ঘিএ-ভাজা বলিয়াই ভ্রম হয়, অথচ বাজারের ঘিএর দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না। ঘিএর উপর ভারতবাসীর যে প্রবল আসক্তি আছে তাহা অন্য তেলে মিটিতে পারে না, কিন্তু নির্গন্ধ ঘনীকৃত তৈলে বহুপরিমাণে মিটিবে। সাধারণ লোকের ঘিএর উপর লোভ আছে কিন্তু পয়সা নাই, সে জন্যই ভেজাল ঘি চলিতেছে। দূষিত চর্বিময় ভেজাল ঘি না খাইয়া নির্দোষ ঘনীকৃত তৈল খাইলে স্বাস্থ্য ও ধর্ম উভয়ই রক্ষা পাইবে। যদি ঘৃতের

সুগন্ধ চাও,তবে ঘনীকৃত তৈলের সহিত কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ ঘৃত মিশাইয়া লইতে পার, বাজারের ঘি খাইয়া আত্মবঞ্চনা করিও না।

বিপক্ষ বলেন—ভেজাল ঘি খুবই চলে ইহা অতি সত্য কথা। কিন্তু ঘনীকৃত তৈলের আমদানির ফলে ঐ ভেজাল বাড়িয়াছে এবং আরও বাড়িবে। ভেজাল ঘিএ চর্বি চীনাবাদাম তৈল ইত্যাদির মিশ্রণ যত সহজে ধরা যায়, ঘনীকৃত তৈলের মিশ্রণ তত সহজে ধরা যায় না। যাহারা সজ্ঞানে বা চক্ষু মুদিয়া সস্তায় ভেজাল ঘি কেনে তাহাদিগকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। কিন্তু যাহারা সাবধানতার ফলে এপর্যন্ত প্রবঞ্চিত হয় নাই, এখন তাহারাও অজ্ঞাতসারে ভেজাল কিনিতেছে। মাখন গলাইলেও বিশ্বাস নাই, কারণ তাহাতেও মারগারিন আকারে ঘনীকৃত তৈল প্রবেশ করিয়াছে। আর এক কথা—ঘৃতে ভাইটামিন আছে, ঘনীকৃত তৈলে নাই, অতএব ঘৃতের পরিবর্তে ঘনীকৃত তৈলের চলন বাড়িলে লোকের স্বাস্থ্যহানি হইবে। আর, যতই বৃক্ষ লতা ফল ফুলের মার্কা দাও এবং উদ্‌ভিজ্জ পদার্থ বলিয়া প্রচার কর, উহা যে অতি সস্তা মাছের তেল হইতে প্রস্তুত নয় তাহারই বা প্রমাণ কি? বিলাতী ব্যবসাদার মাত্রেই তো ধর্ম্মপুত্র নয়। আরও এক কথা—ঘনীকৃত তৈলে ঈষৎ মাত্রায় নিকেল ধাতু দ্রবীভূত থাকে, রাসায়নিকগণ তাহা জানেন। তাহাতে কালক্রমে স্বাস্থ্যহানি হয় কিনা কে বলিতে পারে?

এই বিতর্ক লইয়া বেশী মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। দূরদর্শী দেশহিতৈষী মাত্রই বুঝিবেন—বিদেশী ঘনীকৃত তৈল সর্বথা বর্জনীয়। কেবল একটা কথা বলা যাইতে পারে—ভাইটামিনের অভাব জনিত আপত্তি প্রবল নয়। সাবধানে মাখন গলাইয়া ঘি করিলে ভাইটামিন সমস্তই বজায় থাকে। কিন্তু বাজারের ঘি তৈয়ারির সময় বিশেষ যত্ন লওয়া

হয় না, গোয়ালা ও আড়তদারের গৃহে বহুবার উন্মুক্ত কটাহে জ্বাল দেওয়া হয়, তাহাতে ভাইটামিন অনেকটা নষ্ট হয়, অবশ্য কিছু অবশিষ্ট থাকে। হালুইকরের কটাহে যে ঘি দিনের পর দিন উত্তপ্ত করা হয় তাহাতে কিছুমাত্র ভাইটামিন থাকে কিনা সন্দেহ। এবিষয়ে কেহ পরীক্ষা করিয়াছেন কিনা জানি না। মোট কথা, বাড়ির রান্নায় যে ঘি দেওয়া হয় তাহাতে ভাইটামিন থাকিতে পারে কিন্তু বাজারের ঘৃতপক্ক খাবারে না থাকাই সম্ভবপর। ইহাও বিবেচ্য — দেশের অধিকাংশ লোক ঘি খাইতে পায় না, রান্নায় তেলই বেশী চলে, এবং ঘিএ যে ভাইটামিন থাকে তাহা তেলে নাই।

কিন্তু অন্য যুক্তি অনাবশ্যক। বিদেশী ঘনীকৃত তৈলের বিরুদ্ধে অখণ্ডনীয় যুক্তি—ইহাতে ধর্মহানি হয়। এই ধর্ম গতানুগতিক অন্ধসংস্কার নয়, ভাইটামিনের ধর্মও নয়,—দেশের স্বার্থরক্ষার ধর্ম, আত্মনির্ভরতার ধর্ম। এই ধর্মবুদ্ধির উন্মেষের ফলে ভারতবাসী বুঝিয়াছে যে বিদেশী বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ হয় না, বৃদ্ধি পায় মাত্র। ঘি খাইবার পয়সা নাই, কিন্তু কোন্ দুঃখে বিদেশী তৈল খাইব? এদেশের স্বাভাবিক তৈল কি দোষ করিল? সর্ষপ তৈলের ঝাঁজ সব সময় ভাল না লাগে তো অন্য তৈল আছে। প্রাচীন ভারতে 'তৈল' শব্দে তিল তৈলই বুঝাইত, লোকে তাহাতেই রাঁধিত, বোম্বাই মাদ্রাজ মধ্যপ্রদেশে এখনও তাহা চলে। ইহা স্নিগ্ধ, নির্দোষ, সুপচ। বাঙালীর নাক সিটকাইবার কারণ নাই। সর্ষপ তৈলের উগ্র গন্ধ আমরা সহিতে পারি, বাজারের কচুরি গজা খাইবার সময় ঘিএর বিকৃতি গন্ধ মনে মনে মার্জনা করি, নির্গন্ধ ভেজিটেব্‌ল প্রডক্ট উত্তপ্ত হইলে দুর্গন্ধ হয় তাহাও জানি, তবে তিল চীনাবাদাম তৈলে অভ্যস্ত হইব না কেন? সাহেবের দেখাদেখি কাঁচা শাকে স্যালাড অয়েল

মিশাইয়া খাই, তাহাতে কি গন্ধ নাই? অশ্বত্থামা পিটুলি-গোলা খাইয়া ভাবিয়াছিলেন দুধ, আমরাও একটা নূতন কিছু খাইয়া ভাবিতে চাই ঘি খাইতেছি। এজন্য বিদেশী 'উদ্‌ভিজ্জ পদার্থ' অনাবশ্যক, লুচি কচুরি ভাজার উপযুক্ত স্বদেশী উদ্‌ভিজ্জ তৈল যথেষ্ট আছে। নিমন্ত্রিত কুটুম্বকে ঠকানো হয়তো একটু শক্ত হইবে, কিন্তু দেশবাসীর আত্মসম্মান রক্ষা পাইবে। যদি কলিকাতা ও অন্যান্য নগরের মিউনিসিপালিটি চেষ্টা করেন তবে তিলাদি তৈলের প্রচার সহজেই হইতে পারিবে। শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুন্দরীমোহন দাস, রমেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি ভিষক্‌ মহোদয়গণ প্রবন্ধাদি দ্বারা সাধারণকে এবিষয়ে জ্ঞানদান করিতে পারেন। ময়রা যাহাতে প্রকাশ্যভাবে বিশুদ্ধ তৈলের অথবা ঘৃতমিশ্রিত তৈলের খাবার বেচিতে পারে তাহার ব্যবস্থা আবশ্যক। এইরকম খাবার ঘনীকৃত তৈলের অথবা খারাপ ঘিএর খাবার অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নয়। ঘি খাইব, অভাবে অজ্ঞাত-উপাদান ভেজাল দ্রব্য খাইব—লোকের এই মানসতার পরিবর্তন আবশ্যক। ঘি খাইব, না জুটিলে সজ্ঞানে বিশুদ্ধ তৈল খাইব অথবা ঘৃতমিশ্রিত তৈল খাইব—ইহাই সদ্‌বুদ্ধি।

যদি ভারতীয় মূলধনে ভারতীয় লোকের উদ্‌যোগে ঘনীকৃত তৈলের উৎপাদন হয় তবে ধর্মহানির আপত্তি থাকিবে না। যতদিন তাহা না হয় ততদিন ক্ষমতায় কুলাইলে ঘি খাইব, অথবা সর্ষপ তিল চীনাবাদাম বা নারিকেল তৈল খাইব, অথবা ঘৃত ও তৈল মিশাইয়া খাইব, রুচিতে না বাধিলে স্বদেশী চর্বিও খাইব, কিন্তু বিদেশী ঘনীকৃত তৈল পূতনার স্তনবৎ পরিহার করিব।

ভাষা ও সংকেত

(১৩৩৮)

ভাষা একটা নমনীয় পদার্থ, তাকে টেনে বাঁকিয়ে চটকে আমরা নানা প্রয়োজনে লাগাই। কিন্তু এরকম নরম জিনিসে কোনও পাকা কাজ হয় না, মাঝে মাঝে শক্ত খুঁটির দরকার, তাই পরিভাষার উদ্ভব হয়েছে। পরিভাষা সুদৃঢ় সুনির্দিষ্ট শব্দ, তার অর্থের সংকোচ নেই, প্রসার নেই। আলংকারিকের কথায় বলা যেতে পারে—পরিভাষার অভিধাশক্তি আছে, কিন্তু ব্যঞ্জনা আর লক্ষণার বালাই নেই। পরিভাষা মিশিয়ে ভাষাকে সংহত না করিলে বিজ্ঞানী তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন না।

কিন্তু ভাষা আর পরিভাষাতেও সব সময় কুলয় না, তখন সংকেতের সাহায্য নিতে হয়। যিনি ইমারত গড়েন তিনি কেবল বর্ণনা দ্বারা তাঁর পরিকল্পনা বোধগম্য করতে পারেন না, তাঁকে নক্শা আঁকতে হয়। সে নক্শা ছবি নয়, সংকেতের সমষ্টি মাত্র—পুরনো গাঁথনি বোঝাবার জন্য হলদে রং, নূতন গাঁথনি লাল, কংক্রিটে হিজিবিজি, খিলানের জায়গায় ঢেরা-চিহ্ন, ইত্যাদি। বস্তুর সঙ্গে নক্শার পরিমাপগত সাম্য আছে, কিন্তু অন্য সাদৃশ্য বিশেষ কিছু নেই। অভিজ্ঞ লোকের কাছে নক্শা বস্তুর প্রতিমাস্বরূপ, কিন্তু আনাড়ীর কাছে তা প্রায় নিরর্থক ; বরং ছবি দেখলে বা বর্ণনা পড়লে সে কতকটা বুঝতে পারে।

গানের স্বরলিপিও সংকেত মাত্র। গান শুনলে যে সুখ, স্বরলিপি-

পাঠে তা হয় না, কিন্তু গানের স্বর তাল মান লয় বোঝাবার জন্য স্বরলিপির প্রয়োজন আছে।

একজনের উপলব্ধ বিষয় অন্যজনকে যথাবৎ বোঝাবার সুপ্রয়োজ্য সংক্ষিপ্ত সস্তা উপায়—সংকেত। সংকেতের পূর্বনির্দিষ্ট অর্থ যে জানে তার পক্ষে উদ্দিষ্ট বিষয়ের ধারণা করা অতি সহজ, তাতে ভুলের সম্ভাবনা নেই, ভাল-লাগা মন্দ-লাগা নেই, শুধুই বিষয়ের বোধ। সংকেতের কারবার বুদ্ধিবৃত্তির সহিত, হৃদয়ের সহিত নয়। অবশ্য, নায়ক-নায়িকার সংকেতের কথা আলাদা।

বিজ্ঞানী বহু প্রকার সংকেতের উদ্‌ভাবনা করেছেন। তিনি আশা করেন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনেক উপলব্ধিই কালক্রমে সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা যাবে। একদিন হয়তো গানের স্বরলিপির তুল্য রসলিপি গন্ধলিপি স্পর্শলিপিও উদ্‌ভাবিত হবে, তখন আমরা দ্রাক্ষারসের স্বাদ, চূতমুকুলের গন্ধ, মলয়সমীরের স্পর্শ ফরমুলা দিয়ে ব্যক্ত করতে পারব। শারদাকাশ ঠিক কি রকম নীল, সমুদ্রকল্লোলে কোন্ কোন্ ধ্বনি কত মাত্রায় আছে, তাও ছক-কাটা কাগজে আঁকাবাঁকা রেখায় দেখাব। এখন যেমন জুতো কেনবার সময় বলি—৮ নম্বর চাই, ভবিষ্যতে তেমনি সন্দেশ কেনবার সময় বলব—মিষ্টতা ৬, কাঠিন্য ২। হয়তো সুন্দরীর রংএর ব্যাখ্যান লিখব—দুধ ৩, আলতা ২, কালি ৫। তখন ভাষার অক্ষমতায় বস্তু অপরঞ্জিত হবে না, যা সত্য তাই সাংকেতিক বর্ণনায় অবধারিত হবে।

কবির ব্যবসায় কি উঠে যাবে? তার কোনও লক্ষণ দেখছি না। ভাষার যে উচ্ছৃঙ্খল নমনীয়তা হিসাবী লোককে পদে পদে হয়রান করে তারই উপর কবির একান্ত নির্ভর। তিনি বিজ্ঞানীর মতন বিশ্লেষণ করেন না, প্রত্যক্ষ বিষয় যথাবৎ বোঝাবার চেষ্টা করেন না। প্রত্যক্ষ

ছাড়াও যে অনুভূতি আছে, যা মানুষের সুখদুঃখের মূলীভূত, বিজ্ঞান যার আশেপাশে মাথা ঠুকছে, সেই অনির্বচনীয় অনুভূতি কবি ভাষার ইন্দ্রজালে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করেন। সর্বথা নমনীয় নির্বাধ ভাষাই তাঁর প্রকাশের উপাদান, তাতে ইন্দ্রিয়গম্য ইন্দ্রিয়াতীত সকল সত্যই তিনি ব্যক্ত করতে পারেন। পরিভাষা আর সংকেতে কবির কি হবে? তা ভাবের পিঞ্জর মাত্র।

আদিকবিকে নারদ বলেছেন—

'—সেই সত্য যা রচিবে তুমি;
ঘটে যা তা সব সত্য নহে।—'

যাঁরা নিরেট সত্যের কারবারী তাঁরাও এখন মাথা চুলকে ভাবছেন — হবেও বা।

সাধু ও চলিত ভাষা

(১৩৪০)

কিছুকাল পূর্বে সাধু ও চলিত ভাষা নিয়ে যে বিতর্ক চলছিল এখন তা বড় একটা শোনা যায় না। যাঁরা সাধু অথবা চলিত ভাষার গোঁড়া, তাঁরা নিজ নিজ নিষ্ঠা বজায় রেখেছেন, কেউ কেউ অপক্ষপাতে দুই রীতিই চালাচ্ছেন। পাঠকমণ্ডলী বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন—বাংলা সাহিত্যের ভাষা পূর্বে এক রকম ছিল, এখন দু রকম হয়েছে।

আমরা শিশুকাল থেকে বিদ্যালয়ে যে বাংলা শিখি তা সাধু বাংলা, সেজন্য তার রীতি সহজেই আমাদের আয়ত্ত হয়। খবরের কাগজে মাসিক পত্রিকায় অধিকাংশ পুস্তকে প্রধানত এই ভাষাই দেখতে পাই। বহুকাল বহুপ্রচারের ফলে সাধুভাষা এদেশের সকল অঞ্চলে শিক্ষিতজনের অধিগম্য হয়েছে। কিন্তু চলিতভাষা শেখবার সুযোগ অতি অল্প। এর জন্য বিদ্যালয়ে কোনও সাহায্য পাওয়া যায় না, বহুপ্রচলিত সংবাদ-পত্রাদিতেও এর প্রয়োগ বিরল। এই তথাকথিত চলিতভাষা সমগ্র বঙ্গের প্রচলিত ভাষা নয়, এ ভাষার সঙ্গে ভাগীরথী-তীরবর্তী কয়েকটি জেলার মৌখিকভাষার কিছু মিল আছে মাত্র। এই কারণে কোনও কোনও অঞ্চলের লোক চলিতভাষা সহজে আয়ত্ত করতে পারে, কিন্তু অন্য অঞ্চলের লোকের পক্ষে তা দুরূহ।

যোগেশচন্দ্র-প্রবর্তিত দুটি পরিভাষা এই প্রবন্ধে প্রয়োগ করছি—মৌখিক ও লৈখিক। আমার একটা অযত্নলব্ধ মৌখিকভাষা আছে তা

রাঢ়ের বা পূর্ববঙ্গের বা অন্য অঞ্চলের। চেষ্টা করলে এই ভাষাকে অল্পাধিক বদলে কলকাতার মৌখিকভাষার অনুরূপ ক'রে নিতে পারি, না পারলেও বিশেষ অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমার মুখের ভাষা যেমনই হ'ক, আমাকে একটা লৈখিক বা লেখাপড়ার ভাষা শিখতেই হবে— যা সর্বসম্মত, সর্বাঞ্চলবাসী বাঙালীর বোধ্য, অর্থাৎ সাহিত্যের উপযুক্ত। এই লৈখিকভাষা 'সাধু' হতে পারে কিংবা 'চলিত' হতে পারে। কিন্তু যদি দুটিই কষ্ট ক'রে শিখতে হয় তবে আমার উপর অনর্থক জুলুম হবে। যদি চলিতভাষাই যোগ্যতর হয় তবে সাধুভাষার লোপ হ'লে হানি কি? সাধুভাষায় রচিত যেসব সদ্‌গ্রন্থ আছে তা নাহয় যত্ন ক'রে তুলে রাখব। কিন্তু যে ভাষা অবাঞ্ছনীয় এখন আর তার বৃদ্ধির প্রয়োজন কি? পক্ষান্তরে, যদি সাধুভাষাতেই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তবে এই সুপ্রতিষ্ঠিত বহুবিদিত ভাষার পাশে আবার একটা অনভ্যস্ত ভাষা খাড়া করবার চেষ্টা কেন?

যাঁরা সাধু আর চলিত উভয় ভাষারই ভক্ত তাঁরা বলবেন, কোনওটাই ছাড়তে পারি না। সাধুভাষার প্রকাশশক্তি একরকম, চলিতভাষার অন্যরকম। দুই ভাষাই আমাদের চাই, নতুবা সাহিত্য অঙ্গহীন হবে। ভাষার দুই ধারা স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে, সুবিধা-অসুবিধার হিসাব ক'রে তার একটিকে গলা টিপে মারতে পারি না।

কোনও ব্যক্তি বা বিদ্বৎসংঘের ফরমাশে ভাষার সৃষ্টি স্থিতি লয় হ'তে পারে না। শক্তিশালী লেখকদের প্রভাবে ও সাধারণের রুচি অনুসারে ভাষার পরিবর্তন কালক্রমে ধীরে ধীরে ঘটে। কিন্তু প্রকৃতির উপরেও মানুষের হাত চলে। সাধারণের উপেক্ষার ফলে যদি একটা বিষয় কালোপযোগী হয়ে গ'ড়ে না ওঠে, তথাপি প্রতিষ্ঠাশালী কয়েকজনের

চেষ্টায় অল্পকালেই তার প্রতিকার হ'তে পারে। অতএব সাধু আর চলিত ভাষার সমস্যায় হাল ছেড়ে দেবার কারণ নেই।

একটা ভ্রান্ত ধারণা অনেকের আছে যে চলিতভাষা আর পশ্চিম বঙ্গের মৌখিকভাষা সর্বাংশে সমান। এর ফলে বিস্তর অনর্থক বিতণ্ডা হয়েছে। মৌখিকভাষা যে অঞ্চলেরই হ'ক, মুখের ধ্বনি মাত্র, তা শুনে বুঝতে হয়। লৈখিকভাষা দেখে অর্থাৎ প'ড়ে বুঝতে হয়। মৌখিকভাষার উচ্চারণই তার সর্বস্ব। লৈখিকভাষার চেহারাটাই আসল, উচ্চারণ সকলে একরকমে না করলেও ক্ষতি নেই, মানে বুঝতে পারলেই যথেষ্ট। লৈখিকভাষা সর্বসাধারণের ভাষা, সেজন্য বানানে মিল থাকা দরকার, উচ্চারণ যাই হ'ক।

'ভাষা' শব্দটি আমরা নানা অর্থে প্রয়োগ করি। জাতিবিশেষের কথা ও লেখার সামান্য লক্ষণসমূহের নাম ভাষা, যথা—বাংলা ভাষা। আবার, শব্দাবলীর প্রকার (form)—অর্থাৎ কোন্ শব্দ বা শব্দের কোন্ রূপ প্রয়োজ্য বা বর্জনীয় তার রীতিও ভাষা, যথা—সাধুভাষা। আবার, প্রকার এক হ'লেও ভঙ্গী (style)র ভেদও ভাষা, যথা—আলালী, বিদ্যাসাগরী বা বঙ্কিমী ভাষা।

আলালী আর বঙ্কিমী ভাষা যতই ভিন্ন হ'ক, দুটিই যে সাধুভাষা তাতে সন্দেহ নেই। ভেদ যা আছে তা প্রকারের নয়, ভঙ্গীর। হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা আর রবীন্দ্রনাথের লিপিকার ভাষার আকাশ-পাতাল ব্যবধান, কিন্তু দুটিই চলিত-ভাষায় লেখা; প্রকার এক, ভঙ্গী ভিন্ন। আজকাল সাধু ও চলিত ভাষায় যে সাহিত্য রচনা হচ্ছে তার লক্ষণাবলী তুলনা করলে এইসকল ভেদাভেদ দেখা যায়—

(১) দুই ভাষার প্রকারভেদ প্রধানত সর্বনাম আর ক্রিয়ার রূপের জন্য। 'তাঁহারা বলিলেন, তাঁরা বললেন'।

(২) সাধুভাষার কয়েকটি সর্বনাম কালক্রমে পশ্চিমবঙ্গীয় মৌখিক রূপের কাছাকাছি এসে পড়েছে। রামমোহন রায় লিখতেন 'তাহার-দিগের', তা থেকে ক্রমে 'তাহাদিগের, তাহাদের' হয়েছে। এখন অনেকে সাধুভাষাতেও 'তাদের' লিখছেন। ক্রিয়াপদেও মৌখিকের প্রভাব দেখা যাচ্ছে। 'লিখা, শিখা, শুনা, ঘুরা' স্থানে অনেকে সাধু-ভাষাতেও 'লেখা, শেখা, শোনা, ঘোরা' লিখছেন।

(৩) সর্বনাম আর ক্রিয়াপদ ছাড়াও কতকগুলি অসংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দে পার্থক্য দেখা যায়। সাধুতে 'উঠান, উনান, মিছা, কুয়া, সুতা', চলিতে 'উঠন, উনন, মিছে, কুয়ো, সুতো'। কিন্তু এইরকম বহু শব্দের চলিত রূপই এখন সাধুভাষায় স্থান পেয়েছে। 'আজিকালি, চাউল, একচেটিয়া, লতানিয়া' স্থানে 'আজকাল, চাল, একচেটে, লতানে' চলছে।

(৪) সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ উভয় ভাষাতেই অবাধ। কিন্তু সাধারণত চলিতভাষায় কিছু কম দেখা যায়। এই প্রভেদ উভয় ভাষার প্রকারগত নয়, লেখকের ভঙ্গীগত, অথবা বিষয়ের লঘুগুরুত্বগত।

(৫) আরবী ফারসী প্রভৃতি বিদেশাগত শব্দের প্রয়োগ উভয় ভাষাতেই অবাধ, কিন্তু চলিতভাষায় কিছু বেশী দেখা যায়। এই ভেদও ভঙ্গীগত, প্রকারগত নয়।

(৬) অনেক লেখক কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের মৌখিকরূপ চলিত-ভাষায় চালাতে ভালবাসেন, যদিও সেসকল শব্দের মূল রূপ চলিতভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়। যথা—'সত্য, মিথ্যা, নূতন, অবশ্য' না লিখে 'সত্যি, মিথ্যে, নতুন, অবিশ্যি'। এও ভঙ্গী মাত্র।

উল্লিখিত লক্ষণগুলি বিচার করলে বোঝা যাবে যে সাধুভাষা অতি ধীরে ধীরে মৌখিক শব্দ গ্রহণ করছে, কিন্তু চলিতভাষা কিঞ্চিৎ ব্যগ্রভাবে তা আত্মসাৎ করতে চায়। সাধুভাষার এই মন্থর পরিবর্তনের কারণ—তার বহুদিনের নিরূপিত পদ্ধতি। চলিতভাষার যদৃচ্ছা বিস্তারের কারণ—নিরূপিত পদ্ধতির অভাব। একের শৃঙ্খলার ভার এবং অন্যের বিশৃঙ্খলা উভয়ের মিলনের অন্তরায় হয়ে আছে। যদি লৈখিকভাষাকে কালোপযোগী লঘু শৃঙ্খলায় নিরূপিত করতে পারা যায় তবে সাধু ও চলিতের প্রকারভেদ দূর হবে, একই লৈখিকভাষায় দর্শন বিজ্ঞান পুরাণ ইতিহাস থেকে লঘুতম সাহিত্য পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে লেখা যেতে পারবে, বিষয়ের গুরুত্ব বা লঘুত্ব অনুসারে ভাষার ভঙ্গীর অদলবদল হবে মাত্র।

লৈখিক ও মৌখিক ভাষার ভঙ্গীগত ভেদ অনিবার্য, কারণ, লেখবার সময় লোকে যতটা সাবধান হয় কথাবার্তায় ততটা হ'তে পারে না। কিন্তু দুই ভাষার প্রকারগত ভেদ অস্বাভাবিক। কোনও এক অঞ্চলের মৌখিকভাষার প্রকার আশ্রয় ক'রেই লৈখিকভাষা গড়তে হবে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মৌখিকভাষারই যোগ্যতা বেশী, কারণ, এ ভাষার পীঠস্থান কলকাতা সকল সাহিত্যিকের মিলনক্ষেত্র, রাজধানীও বটে।

কিন্তু যদি পশ্চিমবঙ্গের মৌখিকভাষার উচ্চারণের উপর অতিমাত্র পক্ষপাত করা হয় তবে উদ্যম পণ্ড হবে। শতচেষ্টা সত্ত্বেও বানান আর উচ্চারণের সংগতি সর্বত্র বজায় রাখা সম্ভবপর নয়। 'মতো, ছিলো, কাল, করো' ইত্যাদি কয়েকটি রূপ নাহয় উচ্চারণসূচক (?) করা গেল, কিন্তু আরও শত শত শব্দের গতি কি হবে? বিভিন্ন টাইপের ভারে আমাদের ছাপাখানা নিপীড়িত, তার উপর যদি ও-কারের বাহুল্য আর নূতন নূতন চিহ্ন আসে তবে লেখা আর ছাপার শ্রম বাড়বে মাত্র। 'কাল' অর্থে

কাল্য বা সময় বা কৃষ্ণ, 'করে' অর্থে does কি having done, তার নির্ধারণ পাঠকের সহজবুদ্ধির উপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল, অর্থবোধ থেকেই উচ্চারণ আসবে—অবশ্য নিতান্ত আবশ্যক স্থলে বিশেষ ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উচ্চারণের উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া অনাবশ্যক। কলকাতার লোক যদি পড়ে 'রমণীর মোন', আর বরিশালবাসী যদি পড়ে 'রোমোণীর মঅন', তাতে সর্বনাশ হবে না, পাঠকের অর্থবোধ হ'লেই যথেষ্ট। লৈখিকভাষাকে স্থানবিশেষের উচ্চারণের অনুলেখ করা অসম্ভব। লৈখিক বা সাহিত্যের ভাষার রূপ ও প্রকার সংযত নিরূপিত ও সহজে অধিগম্য হওয়া আবশ্যক, নতুবা তা সর্বজনীন হয় না, শিক্ষারও বাধা হয়। সুতরাং একটু রফা ও কৃত্রিমতা—অর্থাৎ সকল মৌখিকভাষা হ'তে অল্লাধিক প্রভেদ—অনিবার্য।

মোট কথা, চলিতভাষাই একমাত্র লৈখিকভাষা হ'তে পারে যদি তাতে নিয়মের বন্ধন পড়ে এবং সাধুভাষার সঙ্গে রফা করা হয়। বহু লেখক যে আধুনিক চলিতভাষাকে দূর থেকে নমস্কার করেন তার কারণ কেবল অনভ্যাসের কুণ্ঠা নয়, তাঁরা এ ভাষার নমুনা দেখে পথহারা হয়ে যান। বিভিন্ন লেখকের মর্জি অনুসারে একই শব্দের বানান বদলায়, একই রূপের বিভক্তি বদলায়, কভু বা বিশেষ্য সর্বনামের আগে অকারণে ক্রিয়াপদ এসে বসে, বাংলা শব্দাবলীর অদ্ভুত সমাস কানে পীড়া দেয়, ইংরেজী ইডিয়মের সজ্জায় মাতৃভাষা চেনা যায় না। সাধুভাষার প্রাচীন গণ্ডি ছেড়ে চলিতভাষায় এলেই অনেক লেখক অসামাল হয়ে পড়েন।

এমন লৈখিকভাষা চাই যাতে প্রচলিত সাধুভাষা আর মার্জিত জনের মৌখিকভাষা দু'এরই সদ্‌গুণ বজায় থাকে। সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা যে বাক্‌সংকোচ লাভ হয় তা আমরা চাই, আবার মৌখিকভাষার

সহজ প্রকাশশক্তিও হারাতে চাই না। চলিতভাষার লেখকরা একটু অবহিত হ'লেই সর্বগ্রাহ্য সর্বপ্রকাশক লৈখিকভাষা প্রতিষ্ঠালাভ করবে। বলা বাহুল্য, গল্পাদি লঘু সাহিত্যে পাত্রপাত্রীর মুখে সব রকম ভাষারই স্থান আছে, মায় তোতলামি পর্যন্ত।

এখন আমার প্রস্তাব সংক্ষেপে নিবেদন করি।—

(১) প্রচলিত সাধুভাষার কাঠামো অর্থাৎ অন্বয়পদ্ধতি বা syntax বজায় থাকুক। ইংরেজী ভঙ্গীর অনুকরণ সাধারণে বরদাস্ত করবে না, তাতে কিছুমাত্র লাভও নেই।

(২) ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের সাধুরূপের বদলে চলিতরূপ গৃহীত হ'ক।

(৩) অন্যান্য অসংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দের চলিতরূপ গৃহীত হোক। যদি অনভ্যাসের জন্য বাধা হয়, তবে কতকগুলির সাধুরূপ কতকগুলির চলিতরূপ নেওয়া হ'ক। যে শব্দের সাধু ও মৌখিক রূপের ভেদ আদ্য অক্ষরে, তার সাধুরূপই বজায় থাকুক, যথা—'ওপর, পেছন, পেতল, ভেতর' না লিখে 'উপর, পিছন, পিতল, ভিতর'। যার ভেদ মধ্য বা অন্ত্য অক্ষরে, তার মৌখিকরূপই নেওয়া হোক, যথা—'কুয়া, মিছা, সুতা, উঠান, পুরানো' স্থানে 'কুয়ো, মিছে, সুতো, উঠন, পুরনো'।

(৪) যে সংস্কৃত শব্দ চলিতভাষায় অচল নয়—অর্থাৎ বিখ্যাত লেখকগণ যা চলিতভাষায় লিখতে দ্বিধা করেন না, তা যেন বিকৃত করা না হয়। 'সত্য, মিথ্যা, নূতন, অবশ্য' প্রভৃতি বজায় থাকুক।

(৫) এ ভাষায় অনুবাদ করলে রামায়ণাদি সংস্কৃত রচনার ওজোগুণ নষ্ট হবে, অথবা এ ভাষায় দর্শন বিজ্ঞান লেখা যাবে না—এমন আশঙ্কা ভিত্তিহীন। দুরূহ সংস্কৃত শব্দে আর সমাসে সাধুভাষার একচেটে

অধিকার নেই। 'বাত্যাবিক্ষোভিত মহোদধি উদ্বেল হইয়া উঠিল' না লিখে '... হয়ে উঠল' লিখলেই গুরুচণ্ডাল দোষ হবে না। দু দিনে অভ্যাস হয়ে যাবে। শুনতে পাই ধুতির সঙ্গে কোট পরতে নেই, পাঞ্জাবি পরতে হয়। এইরকম একটা ফ্যাশনের অনুশাসন বাংলা ভাষাকে অভিভূত করেছে। ধারণা দাঁড়িয়েছে — চলিতভাষা একটা তরল পদার্থ, তাতে হাত-পা ছড়িয়ে সাঁতার কাটা যায়, কিন্তু ভারী জিনিস নিয়ে নয়। ভার বইতে হ'লে শক্ত জমি চাই, অর্থাৎ সাধুভাষা। এই ধারণার উচ্ছেদ দরকার। চলিতভাষাকে বিষয় অনুসারে তরল বা কঠিন করতে কোনও বাধা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশে নবরচিত পাঠ্যপুস্তকে যদি এই ভাষা চলে তবে তা কয়েক বৎসরের মধ্যেই সাধারণের আয়ত্ত হবে। ব্যাকরণ আর অভিধানে এই ভাষার শব্দাবলীর বিবৃতি দিতে হবে, অবশ্য সাধুভাষাকেও উপেক্ষা করা চলবে না, কারণ, সে ভাষার বহু পুস্তক বিদ্যালয়ে পাঠ্য থাকবে। কালক্রমে যখন সাধুভাষা প্রত্ন হয়ে পড়বে তখনও তা স্পেনসার শেকস্পিয়রের ভাষার তুল্য সমাদরে অধীত হবে। নূতন লৈখিকভাষাও চিরকাল একরকম থাকবে না। শক্তিশালী লেখকগণের প্রভাবে পরিবর্তন আসবেই, এবং কালে কালে যেমন পঞ্জিকাসংস্কার আবশ্যক হয়, তেমনি যোগ্যজনের চেষ্টায় লৈখিকভাষারও নিয়মসংস্কার আবশ্যক হবে।

বাংলা পরিভাষা

(১৩৪০)

অভিধানে 'পরিভাষা'র অর্থ—সংক্ষেপার্থ শব্দ। অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে কোনও বিষয় সুনির্দিষ্ট ভাবে ব্যক্ত করা যায় তা পরিভাষা। যে শব্দের অনেক অর্থ, সে শব্দও যদি প্রসঙ্গবিশেষে নির্দিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয় তবে তা পরিভাষাস্থানীয়। সাধারণত 'পরিভাষা' বললে এমন শব্দ বা শব্দাবলী বোঝায় যার অর্থ পণ্ডিতগণের সম্মতিতে স্থিরীকৃত হয়েছে এবং যা দর্শনবিজ্ঞানাদির আলোচনায় প্রয়োগ করলে অর্থবোধে সংশয় ঘটে না।

সাধারণ লোকে কথাবার্তায় চিঠিপত্রে অসংখ্য শব্দ নির্দিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করে, কিন্তু বিদ্যালোচনার জন্য করে না, সেজন্য আমাদের খেয়াল হয় না যে সেসকল শব্দ পারিভাষিক। 'স্বামী, স্ত্রী, গাই, ষাঁড়, বন্ধক, তামাদি, লোহা, তামা, চৌকো, গোল' প্রভৃতি শব্দের পারিভাষিক খ্যাতি নেই, কারণ এসকল শব্দ অতিপরিচিত। বিলাতে একটা নূতন ধাতু আবিষ্কৃত হ'ল, আবিষ্কর্তা তার পারিভাষিক নাম দিলেন 'অ্যালুমিনিয়ম'। বহুদিন এই নাম কেবল পণ্ডিতমণ্ডলীর গবেষণায় আবদ্ধ রইল। এখন অ্যালুমিনিয়মের ছড়াছড়ি, কিন্তু নামের পারিভাষিক খ্যাতি অক্ষুণ্ণ আছে। 'প্লাটিনম অ্যালুমিনিয়ম ক্রোমিয়ম' প্রভৃতি নাম বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের সৃষ্ট, সেজন্য পরিভাষা রূপে খ্যাত। 'লোহা তামা সোনা' প্রভৃতি নাম পণ্ডিতাগমের পূর্ববর্তী তাই অখ্যাত। পণ্ডিতগণ যদি বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে

'প্লাটিনম অ্যালুমিনিয়ম' প্রভৃতি নামজাদা শব্দের পাশে স্থান দেন, তবে 'লোহা তামা সোনা'ও পরিভাষা রূপে খ্যাত হবে। যে শব্দ সাধারণে আলগা ভাবে প্রয়োগ করে তাও পণ্ডিতগণের নির্দেশে পরিভাষা রূপে গণ্য হতে পারে। সাধারণ প্রয়োগে রুই পুঁটি চিংড়ি তিমি সবই 'মৎস্য'। কিন্তু পণ্ডিতরা যদি যুক্তি ক'রে স্থির করেন যে 'মৎস্য' বললে কেবল বোঝাবে—কান্‌কো-যুক্ত হাত-পা-বিহীন মেরুদণ্ডী অণ্ডজ (এবং আরও কয়েকটি লক্ষণ যুক্ত) প্রাণী, তবে 'মৎস্য' নাম পারিভাষিক হবে এবং চিংড়ি তিমিকে বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে মৎস্য বলা চলবে না।

বিদ্যাচর্চায় যত পরিভাষা আবশ্যক, সাধারণ কাজে তত নয়। কিন্তু জনসাধারণেও নূতন নূতন বিষয়ের পরিচয় লাভ করছে সেজন্য বহু নূতন পারিভাষিক শব্দ অবিদ্বানেও শিখছে। যে জিনিস সাধারণের কাজে লাগে তার নাম লোকের মুখে মুখেই প্রচারিত হয় এবং সে নাম একবার শিখলে লোকে সহজে ছাড়তে চায় না। পণ্ডিতরা যদি নূতন নাম চালাবার চেষ্টা করেন তবে সাধারণের তরফ থেকে বাধা আসতে পারে। বাংলা পরিভাষা সংকলনকালে এই বাধার কথা মনে রাখা দরকার।

আমাদের দেশে এখনও উচ্চশিক্ষার বাহন ইংরেজী ভাষা। নিম্নশিক্ষায় মাতৃভাষা চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। শিক্ষা উচ্চই হ'ক আর নিম্নই হ'ক, মাতৃভাষাই যে শ্রেষ্ঠ বাহন তা সকলে ক্রমশ বুঝতে পারছেন। মাতৃভাষার প্রয়োগের উপযুক্ত পরিভাষা যত দিন প্রতিষ্ঠালাভ না করবে তত দিন বাহন পঙ্গু থাকবে। অতএব বাংলা পরিভাষার প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। বাংলা দেশ যদি স্বাধীন হ'ত, রাজভাষা যদি বাংলা হ'ত, বহু নব নব দ্রব্য ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যদি এদেশে আবিষ্কৃত হ'ত, তবে আমাদের পরিভাষা দেশীয় ভাষার বশে স্বচ্ছন্দে গ'ড়ে উঠত এবং বিদ্বান অবিদ্বান নির্বিশেষে

সকলেই তা মেনে নিত, যেমন ইংলাণ্ডে হয়েছে। কিন্তু আমাদের অবস্থা সেরূপ নয়। এদেশে যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া হয় তা অতি অল্প, বা হয় তার সংবাদ ইংরেজীতেই প্রকাশিত হয়। সুতরাং বাংলা ভাষার জন্য পরিভাষা সংকলিত হ'লেও তার প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজী শব্দ। দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী একমত হয়ে একটা বাংলা পরিভাষার ফর্দ মেনে নিতে পারেন, এমন প্রতিজ্ঞাও করতে পারেন যে তাঁদের পুস্তকে প্রবন্ধে ভাষণে বিলাতী শব্দ বর্জন করবেন (অবশ্য চাকরির কাজে তা পারবেন না)। কিন্তু পরিভাষাদ্বারা সূচিত দ্রব্য যদি বিদেশ থেকে আসে এবং সাধারণের ব্যবহারে লাগে, তবে নূতন নাম চালানো কঠিন হবে। বিদেশ থেকে আয়োডিন আসে, প্রেরকের চালানে ঐ নাম লেখা থাকে; দোকানদার ঐ নামেই বেচে—তাকে 'এতিন' বা 'নীলিন' শেখানো অসম্ভব। তার মারফত জনসাধারণেও ইংরেজী নাম শেখে। যাঁরা মাতৃভাষায় বিদ্যাবিতরণে অগ্রকর্মী হবেন তাঁদের পক্ষেও দেশী নামে নিষ্ঠা বজায় রাখা শক্ত হবে। তাঁরা বিদ্যা অর্জন করবেন ইংরেজী পরিভাষার সাহায্যে আর প্রচার করবেন বাংলা পরিভাষায় — এই দ্বৈভাষিক অবস্থা সহজ নয়। তাঁদের নানা ক্ষেত্রে স্খলন হবে। যাদের শিক্ষার জন্য দেশী পরিভাষার সৃষ্টি তারা যদি ইংরেজী নাম ছাড়তে না চায় তবে শিক্ষকও বিদ্রোহী হবেন। বাংলা ভাষায় প্রয়োগযোগ্য পরিভাষা আমাদের অবশ্য চাই, কিন্তু সংকলনকালে ভুললে চলবে না যে ব্যবহারক্ষেত্রে ইংরেজীর প্রবল প্রতিযোগিতা আছে।

সাধারণে 'আয়োডিন, অক্সিজেন, মোটর, কার্বুরেটর, কলেরা, ভ্যাকসিন' প্রভৃতি শব্দে অভ্যস্ত হয়েছে, এগুলির বাংলা নাম চলবার সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু কয়েকটি নবরচিত বাংলা শব্দের চলন সহজেই

হয়েছে, যথা—‘উড়োজাহাজ, বেতারবার্তা, আবহসংবাদ’। কতকগুলি বিকট শব্দও চলছে, যেমন ‘আইন-অমান্য-আন্দোলন’। রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ সত্ত্বেও ‘বাধ্যতামূলক’ প্রবল প্রতাপে চলছে। এই প্রচলন খবরের কাগজের দ্বারা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার প্রচারে এ সাহায্য মিলবে না। বিভিন্ন লেখকের পুস্তকে প্রবন্ধে যদি একই রকম পরিভাষা গৃহীত হয়, তবে প্রচার অনেকটা সহজ হবে।

এদেশে বহু বৎসর থেকে পরিভাষা সংকলনের চেষ্টা হয়ে আসছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের দপ্তরে অনেক পরিভাষা সংগৃহীত হয়েছে, ‘প্রকৃতি’ পত্রিকায় প্রায় প্রতি সংখ্যায় পরিভাষা প্রকাশিত হচ্ছে। তা ছাড়া অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনে পরিভাষা রচনা করেছেন। এই সকল পরিভাষার প্রায় সমস্তই প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রচলিত শব্দ, অথবা সংকলয়িতার স্বরচিত সংস্কৃত শব্দ। এপর্যন্ত আয়োজন যা হয়েছে তা নিতান্ত কম নয়, কিন্তু ভোক্তা বিরল। তার একটি কারণ — একই ইংরেজী শব্দের নানা প্রতিশব্দ হয়েছে কিন্তু কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য তার নির্বাচন হয় নি। সংকলয়িতা নিজের রচনায় তাঁর পছন্দমত শব্দ প্রয়োগ করেন বটে, কিন্তু সাধারণ লেখক দিশাহারা হয়। আর এক কারণ— সংগ্রহ বৃহৎ হ’লেও অসম্পূর্ণ। সর্বাপেক্ষা প্রবল কারণ — ইংরেজী পরিভাষার বিপুল প্রতিষ্ঠা।

আজকাল বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ যে ভঙ্গীতে লেখা হয় তা লক্ষ্য করলে আমাদের বাধা কোথায় আর সিদ্ধি কোন্ পথে তার একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিভিন্ন লেখকের রচনা থেকে কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি—

(গ্রামোফোন-রেকর্ড)। ‘Masterটি পরিষ্কার করিয়া ইহার উপর

Bronze Powder ছড়ান হয়। Powder যাহাতে ইহার প্রত্যেক grooveএর ভিতর উত্তমরূপে প্রবেশ করে তাহা দেখিতে হইবে। পরে Electroplate করিয়া ইহার উপর Copper deposit করা হয়। এই deposit পরিমাপ অনুযায়ী পুরু হইলে ইহাকে master হইতে পৃথক করা হয়। Masterএর music lines তখন এই Copyর উপর উঠিয়া আসে। এই Copyকে Original বলা হয়।'

লেখক পরিশেষে বলেছেন—'টেক্‌নিক্যাল ডিটেইলস্‌এর মধ্যে যাই নাই'। যান নি তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। ইনি ভাষার দৈন্যের প্রতি দৃক্‌পাত করেন নি, যেমন-তেমন উপায়ে নিজের বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। আর একটি নমুনা দিচ্ছি। প্রবন্ধ আমার কাছে নেই, কিন্তু নামটি কণ্ঠস্থ আছে, তা থেকেই রচনার পরিচয় হবে—

'নেত্রজনের উপস্থিতিতে অসিতীলিনের উপর কুলহরিণের ক্রিয়া'।

এই লেখক তাঁর বক্তব্য বোধগম্য করবার জন্য মোটেই ব্যস্ত নন, বিভীষিকা দেখানোও তাঁর উদ্দেশ্য নয়। ইনি নবলব্ধ পরিভাষা নিয়ে কিঞ্চিৎ কসরত করেছেন মাত্র। একজন প্রথিতনামা মনীষীর রচনা থেকে উদাহরণ দিচ্ছি—

'মণিসমূহের নিয়ত সংস্থান অসংখ্য প্রকার। কিন্তু তৎসমুদায়কে ছয়টি মূল সংস্থানে বিভক্ত করিতে পারা যায়। এই ছয় মূল সংস্থানের প্রত্যেকে দ্বিবিধ,—স্তম্ভাকার (prismatic) এবং শিখরাকার (pyramidal)। এই সকল সংস্থান বুঝিবার নিমিত্ত মণির মধ্যে কয়েকটি অক্ষরেখা কল্পিত হইয়া থাকে। কোন নিয়তাকার মণির দুই বিপরীত স্থানকে মনে মনে কোন রেখা দ্বারা যোগ করিলে তাহার

অক্ষরেখা পাওয়া যায়। যথা, দুই বিপরীত কোণ, কিংবা দুই বিপরীত পার্শ্বের মধ্যস্থল, কিংবা দুই বিপরীত ধারের মধ্যস্থল।'

লেখকের বক্তব্য অনধিকারীর পক্ষে কিঞ্চিৎ দুরূহ হ'তে পারে, কিন্তু তাঁর পদ্ধতি যে বাংলা ভাষার প্রকৃতির অনুকূল তাতে সন্দেহ নেই। একজন লোকপ্রিয় অধ্যাপকের রচনার নমুনা—

'কমকর্ফ কয়েল ছাড়া আরও অনেক প্রক্রিয়া দ্বারা পদার্থ হইতে ইলেকট্রন বাহির করা যায়। রঞ্জনরশ্মি কোন পদার্থের উপর ফেলিলে, বা সেই পদার্থ রেডিয়মের ন্যায় কোন ধাতুর নিকট রাখিলে সেই পদার্থ হইতে ইলেকট্রন নির্গত হয় ··· বেশী কিছু নয়, কোন পদার্থ একটু বেশী উত্তপ্ত হইলে উহা হইতে ইলেকট্রন নির্গত হইতে থাকে।'

এই লেখক ইংরেজী শব্দ নির্ভয়ে আত্মসাৎ করেছেন, তথাপি মাতৃ-ভাষার জাতিনাশ করেন নি।

বাংলা ভাষার উপযুক্ত পরিভাষা সংকলন একটি বিরাট কাজ, তার জন্য অনেক লোকের চেষ্টা আবশ্যক। কিন্তু এই চেষ্টা সংঘবদ্ধ ভাবে একই নিয়ম অনুসারে করা উচিত, নতুবা পরিভাষার সামঞ্জস্য থাকবে না। প্রথম কর্তব্য—সমস্ত বিষয়টিকে ব্যাপক দৃষ্টিতে নানা দিক থেকে দেখা, তাতে বিভিন্ন বিভাগের প্রয়োজন সম্বন্ধে কতকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে, উপায় স্থির করাও হয়তো সহজ হবে। এই প্রবন্ধে কেবল সেই দিগ্‌দর্শনের চেষ্টা করব।

সকল বিদ্যার পরিভাষাকেই মোটামুটি এই কটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—

বিশেষ (individual)। যথা—সূর্য, বুধ, হিমালয়।

দ্রব্য (বস্তু, substance ; অথবা সামগ্রী, article)। যথা—কাষ্ঠ, লৌহ, জল ; দীপ, চক্র, অরণ্য।

বর্গ (class)। যথা—ধাতু, নক্ষত্র, জীব, স্তন্যপায়ী।

ভাব (abstract idea)। যথা—গতি, সংখ্যা, নীলত্ব, স্মৃতি।

বিশেষণ (adjective)। যথা—তরল, মিষ্ট, আকৃষ্ট।

ক্রিয়া (verb)। যথা—চলা, ঠেলা, ওড়া, ভাসা।

বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীবিভাগ সর্বত্র স্পষ্ট নয়। কতকগুলি শব্দ প্রয়োগ অনুসারে দ্রব্য বর্গ বা বিশেষণ বাচক হ'তে পারে। কতকগুলি শব্দ কোন শ্রেণীতে পড়ে স্থির করা কঠিন, যেমন—দেশ, কাল, আলোক, কেন্দ্র।

দেখা যায় যে এক এক শ্রেণীর শব্দ কোনও বিদ্যায় বেশী দরকার কোনও বিদ্যায় কম দরকার। জ্যোতিষে ও ভূগোলে বিশেষবাচক শব্দ অনেক চাই, কিন্তু অন্যান্য বিদ্যায় খুব কম, অথবা অনাবশ্যক। দ্রব্য-বাচক শব্দ রসায়নে অত্যন্ত বেশী, জীববিদ্যায় (botany, zoology anatomy ইত্যাদিতে) কিছু কম, মণিকবিদ্যায় (mineralogy) আর একটু কম, পদার্থবিদ্যা (physics) ও ভূবিদ্যায় (geology) আরও কম, দর্শন ও মনোবিদ্যায় প্রায় নেই, গণিতে মোটেই নেই। বর্গবাচক শব্দ জীববিদ্যায় খুব বেশী, রসায়ন ও মণিকবিদ্যায় অপেক্ষাকৃত কম, অন্যান্য বিদ্যায় আরও কম। ভাব বিশেষণ ও ক্রিয়া বাচক শব্দ সকল বিদ্যাতেই প্রায় সমান। সকল বিদ্যার পরিভাষা যদি একযোগে বিচার করা যায় তবে দেখা যাবে যে মোটের উপর দ্রব্যবাচক শব্দ সবচেয়ে বেশী, তার পর যথাক্রমে বর্গবাচক, ভাব-বিশেষণ-ক্রিয়া-বাচক এবং বিশেষ-বাচক শব্দ।

ইংরেজী পরিভাষার ফর্দ সম্মুখে রেখেই সংকলয়িতাকে কাজ করতে হবে, অতএব ইংরেজী পরিভাষার স্বরূপ বিচার করা কর্তব্য, তাতে উপায়ের সন্ধান মিলতে পারে। ইংরেজী পরিভাষা জাতি (origin) অনুসারে এইরূপে ভাগ করা যেতে পারে—

a. সাধারণ ইংরেজী শব্দ। যথা—iron, solid।

b. প্রচলিত অন্য ভাষার শব্দ। যথা—lesion, canyon, breccia, typhoon, totem।

c. গ্রীক লাটিন (আরবী সংস্কৃত বিরল) প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার শব্দ বা তার যৌগিক রূপ অথবা অপভ্রংশ। যথা—atom, spectrum, alcohol, ferrous, vertebrate।

d. কৃত্রিম পদ্ধতিতে রূপান্তরিত গ্রীক লাটিন বা অন্য শব্দ। যথা—glycerine, methanol, aniline, farad।

ইংরেজী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদিতে দেখা যায়—যেখানে ভুল বোঝবার সম্ভাবনা নেই সেখানে c d র সঙ্গে সঙ্গে a b অবাধে চলে। কিন্তু যেখানে স্পষ্টতর নির্দেশ বা সংক্ষেপ আবশ্যক, সেখানে a শব্দ প্রায় চলে না, তৎস্থানে c d প্রযুক্ত হয় এবং b কিছু কিছু চলে। যথা iron implements, iron salts, spirit of wine, knee-cap, shedding of leaves; অথচ ferrous (বা ferric) sulphate, alcohol metabolism, patellar fracture, deciduous leaves।

বাংলা ভাষার জন্য পরিভাষা সংকলনকালে নিম্নলিখিত উপাদানের যোগ্যতা বিচার করা যেতে পারে—

ক। সাধারণ বাংলা শব্দ।

খ। হিন্দী-উর্দু ফারসী আরবী শব্দ।

গ। ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ (পূর্ববর্ণিত a b c d)।

ঘ। প্রাচীন বা নবরচিত সংস্কৃত শব্দ।

ঙ। মিশ্র শব্দ, অর্থাৎ কৃত্রিম পদ্ধতিতে রূপান্তরিত বা যোজিত বিভিন্নজাতীয় শব্দ।

পরিভাষা যদিও মুখ্যত বাঙালীর জন্য সংকলিত হবে, তথাপি অধিকাংশ শব্দ যাতে ভারতের অন্য প্রদেশবাসীর (বিশেষত হিন্দী উড়িয়া মারাঠী গুজরাটী প্রভৃতি ভাষীর) গ্রহণযোগ্য বা সহজবোধ্য হয় সে চেষ্টা করা উচিত।* তাতে বিভিন্ন প্রদেশের ভাববিনিময়ের সুবিধা হবে। পূর্বোক্ত c d শব্দাবলী সকল ইওরোপীয় ভাষায় চলে। ভারতের পক্ষে গ ঘ এর সেইরূপ উপযোগিতা আছে।

আধুনিক ইওরোপীয় ভাষাসমূহের সঙ্গে গ্রীক লাটিনের যে সম্বন্ধ, তার চেয়ে বাংলা হিন্দী প্রভৃতির সঙ্গে সংস্কৃতের সম্বন্ধ অনেক বেশী। সেজন্য এদেশে সংস্কৃত পরিভাষা (ঘ) সহজেই মর্যাদা পাবে। ইংরেজী পরিভাষার (গ) উপযোগিতাও কম নয়, তার কারণ পরে বলছি। এই দুই জাতীয় পরিভাষার পরেই সাধারণ বাংলা শব্দের (ক) স্থান। এরকম শব্দ সাধারণ বিবৃতিতে অবাধে চলবে, যেমন ইংরেজীতে a চলে। তারপরে খ-এর, বিশেষত হিন্দী-উর্দু শব্দের স্থান; কারণ, হিন্দী-উর্দু সুসমৃদ্ধ ভাষা, বাংলার প্রতিবেশী, এবং ভারতের বহু অঞ্চলে বোধ্য। বাংলায় ফারসী আরবী শব্দ অনেক আছে। যদি উপযুক্ত শব্দ পাওয়া যায় তবে আরও কিছু ফারসী আরবী আত্মসাৎ করলে হানি নেই। পরিশেষে মিশ্র শব্দের (ঙ) স্থান। এরূপ শব্দ কিছু কিছু দরকার হবে। যদি 'focus' বাংলায় নেওয়া হয়, তবে focussed = ফোকসিত, long-focus = দীর্ঘফোকস।

বাংলা পরিভাষা সংকলনের সময় ইংরেজী শব্দের প্রতিযোগিতা মনে রাখতে হবে। বিদ্যালয়ের ছাত্র বাধ্য হয়ে বাংলা পাঠ্যপুস্তক থেকে দেশী পরিভাষা শিখবে। যিনি বিদ্যালয়ের শাসনে নেই অথচ বিদ্যাচর্চা করতে চান, তাঁর যদি মাতৃভাষায় অনুরাগ থাকে তবে তিনি কিছু কষ্ট স্বীকার ক'রেও দেশী পরিভাষা আয়ত্ত করবেন। কিন্তু জনসাধারণকে বশে আনা সহজ নয়। বিদ্যা মাত্রের যে অঙ্গ তত্ত্বীয় (theoretical), তার সঙ্গে সাধারণের বিশেষ যোগ নেই। বিদ্যার যে অঙ্গ ব্যাবহারিক (applied), সাধারণে তার অল্পাধিক খবর রাখে। তত্ত্বীয় অঙ্গে দেশী পরিভাষার প্রচলন অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ জনসাধারণের রুচির বশে চলতে হয় না। কিন্তু ব্যাবহারিক অঙ্গের সহিত বিদেশী দ্রব্য ও বিদেশী শব্দের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সাধারণ লোকে পথে হাটে বাজারে কর্মস্থানে যে বিদেশী শব্দ শিখবে তাই চালাবে, এর উদাহরণ পূর্বে দিয়েছি। এই বাধা লঙ্ঘন করা চলবে না, ব্যাবহারিক অঙ্গে বহু পরিমাণে বিদেশী শব্দ নেনে নিতে হবে।

মাতৃভাষার বিশুদ্ধিরক্ষাই যদি প্রধান লক্ষ্য হয় তবে পরিভাষাসংকলন পণ্ড হবে। পরিভাষার একমাত্র উদ্দেশ্য—বিভিন্ন বিদ্যার চর্চা এবং শিক্ষার বিস্তারের জন্য ভাষার প্রকাশশক্তি বর্ধন। পরিভাষা যাতে অল্পায়াসে অধিগম্য হয় তাও দেখতে হবে। এনিমিত্ত রাশি রাশি বৈদেশিক শব্দ আত্মসাৎ করলেও মাতৃভাষার গৌরবহানি হবে না। বহু বৎসর পূর্বে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখেছেন—

'মহৈশ্বর্যশালিনী আর্যা সংস্কৃত ভাষাও যে অনার্যদেশজ শব্দ অজস্রভাবে গ্রহণ করিয়া আত্মপুষ্টি সাধনে পরাঙ্মুখ হন নাই, তাহা সংস্কৃত ভাষার অভিধান অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীনকালে জ্ঞান

বিজ্ঞান বিষয়ে যেসকল বৈদেশিকের সহিত প্রাচীন হিন্দুর আদান প্রদান চলিয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতেও সংস্কৃত ভাষা ঋণস্বীকারে কাতর হয় নাই।...আমাদের পক্ষে সেইরূপ ঋণগ্রহণে লজ্জা দেখাইলে কেবল অহম্মুখতাই প্রকাশ পাইবে।' (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সন ১৩০১)।

বাংলা ভাষার জননী সংস্কৃত হতে পারেন, কিন্তু গ্রীক ফারসী আরবী পোর্তুগিজ ইংরেজীও আমাদের ভাষাকে স্তন্যদানে পুষ্ট করেছে। যদি প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য সাবধানে নির্বাচন ক'রে আরও বিদেশী শব্দ আমরা গ্রহণ করি, তবে মাতৃভাষার পরিপুষ্টি হবে, বিকার হবে না। অপ্রয়োজনে আহার করলে অজীর্ণ হয়, প্রয়োজনে হয় না। যদি বলি — 'ওয়াইফের টেম্পারটা বড়ই ফ্রেট্‌ফুল হয়েছে' তবে ভাষাজননী ব্যাকুল হবেন। যদি বলি — 'মোটরের ম্যাগ্‌নেটোটা বেশ ফিনকি দিচ্ছে', তবে আমাদের আহরণের শক্তি দেখে ভাষাজননী নিশ্চিন্ত হবেন।

ইওরোপ আমেরিকায় যে International Scientific Nomenclature সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে তার দ্বারা জগতের পণ্ডিতমণ্ডলী অনায়াসে জ্ঞানের আদান প্রদান করতে পারছেন। এই পরিভাষা একবারে বর্জন করলে আমাদের 'অহম্মুখতা'ই প্রকাশ পাবে। সমস্ত না হোক, অনেকটা আমরা নিতে পারি। যে বৈদেশিক শব্দ নেওয়া হবে, তার বাংলা বানান মূলানুযায়ী করাই উচিত। বিকৃত ক'রে মোলায়েম করা অনাবশ্যক ও প্রমাদজনক। এককালে এদেশে ইতর ভদ্র সকলেই ইংরেজীতে সমান পণ্ডিত ছিলেন, তখন general থেকে 'জাঁদরেল', hospital থেকে 'হাসপাতাল' হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে যুগ নেই, বহুকাল ইংরেজী প'ড়ে আমাদের জিবের জড়তা অনেকটা ঘুচেছে। সংস্কৃত শব্দেও কটমটির অভাব নেই। কেউ যদি ভুল উচ্চারণ

ক'রে 'ঘাচ্‌ঞা'কে 'ঘাচিজ্ঞা', 'জনৈক'কে 'জৈনিক', 'মোটর'কে 'মটোর' 'গ্লিসারিন'কে 'গিল্‌ছেরিন' বলে, তাতে ক্ষতি হবে না — যদি বানান ঠিক থাকে।

এখন সংকলনের উপায় চিন্তা করা যেতে পারে। আমাদের উপকরণ — এক দিকে দেশী শব্দ, অর্থাৎ বাংলা সংস্কৃত হিন্দী ইত্যাদি; অন্য দিকে ইংরেজী শব্দ। কোথায় কোন্ শব্দ গ্রহণযোগ্য? ধরাবাঁধা বিধান দেওয়া অসম্ভব। মোটামুটি পথনির্ণয়ের চেষ্টা করব।

১। আমাদের দেশে বহুকাল থেকে কতকগুলি বিদ্যার চর্চা আছে, যথা—দর্শন, মনোবিদ্যা, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিষ, ভূগোল, শারীরবিদ্যা, প্রভৃতি। এইসকল বিদ্যার বহু পরিভাষা এখনও প্রচলিত আছে। শাস্ত্র অনুসন্ধান করলে আরও পাওয়া যাবে এবং সেই উদ্ধারকার্য অনেকে করেছেন। এই সমস্ত শব্দ আমাদের সহজেই গ্রহণীয়। এই শব্দসম্ভারের সঙ্গে আরও অনেক নবরচিত সংস্কৃত শব্দ অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে। গণিতে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ বর্গ ঘাত (power) প্রভৃতি প্রাচীন শব্দের সঙ্গে নবরচিত কলন (calculus), অবঘাতন (evolution), উদ্‌ঘাতন (involution) সহজেই চলবে। বর্তমান কালে এইসকল বিদ্যার বৃদ্ধির ফলে বহু নূতন পরিভাষা ইওরোপে সৃষ্টি হয়েছে। তার অনেকগুলির দেশী প্রতিশব্দ রচনা করা যেতে পারে। কিন্তু যে ইংরেজী পারিভাষিক শব্দ অত্যন্ত রূঢ় (যেমন focus, thyroid) তা যথাবৎ বাংলা বানানে নেওয়াই উচিত।

২। কতকগুলি বিদ্যা আধুনিক, অর্থাৎ পূর্বে এদেশে অল্পাধিক চর্চিত হ'লেও এখন একবারে নূতন রূপ পেয়েছে, যথা — পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, খনিকবিদ্যা, জীববিদ্যা। এইসকল বিদ্যার জন্য অসংখ্য পরিভাষা

আবশ্যক। যে শব্দ আমাদের আছে তা রাখতে হবে, বহু সংস্কৃত শব্দ নূতন ক'রে গড়তে হবে, পাওয়া গেলে কিছু কিছু হিন্দী ইত্যাদি ভাষা থেকেও নিতে হবে; অধিকন্তু ইংরেজী ভাষায় প্রচলিত পারিভাষিক শব্দ রাশি রাশি আত্মসাৎ করতে হবে।

৩। বিশেষবাচক শব্দ আমাদের যা আছে তা থাকবে, যেমন— 'চন্দ্র, সূর্য, বুধ, হিমালয়, ভারত, পারস্য'। যে নাম অর্বাচীন কিন্তু বহুপ্রচলিত, তাও থাকবে, যেমন— 'প্রশান্তমহাসাগর'। কিন্তু অবশিষ্ট শব্দের ইংরেজী নামই গ্রহণীয়, যথা— 'নেপচুন, আফ্রিকা, আটলান্টিক'।

৪। দ্রব্যবাচক শব্দের যদি দেশী নাম থাকে, তো রাখব, যেমন— 'স্বর্ণ লৌহ' বা 'সোনা লোহা'। যদি না থাকে তবে প্রচুর ইংরেজী নাম নেব। বৈজ্ঞানিক বস্তু যে নামে পরিচিত, সেই নামই বহু পরিমাণে আমাদের মেনে নিতে হবে। রাসায়নিক ও খনিজ বস্তু এবং যন্ত্রাদি (যথা—মোটর, এঞ্জিন, পাম্প, স্কেল, লেন্স, থার্মমিটার, স্টেথস্কোপ) সম্বন্ধে এই কথা খাটে। রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের তালিকায় স্বর্ণ লৌহ গন্ধক প্রভৃতি নামের সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেন ক্লোরিন সোডিয়ম থাকবে। ফরমুলা লিখতে ইংরেজী বর্ণই লিখব, ইংরেজী বর্ণমালা আমাদের অপরিচিত নয়। সাধারণত লিখব—'লৌহ কঠিন, পারদ তরল। লেখবার কালি তৈয়ার করতে হিরাকস লাগে'। কিন্তু দরকার হ'লেই নির্ভয়ে লিখব— 'ফেরস সালফেট, অর্থোডাইক্লোরোবেনজিন, ম্যাগনিসাইট, ক্লমকর্ফ কয়েল, ইলেকট্রন'। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা রাসায়নিক পরিভাষা রচনায় আশ্চর্য কৌশল দেখিয়েছেন। কিন্তু যে পরিভাষা কল্পান্তেও চলবে

না। 'অ্যান্টিমনি থায়োফস্ফেট'এর চেয়ে মণীন্দ্রবাবুর 'অস্তমনসগুন্ধভাস্ফেত' কিছুমাত্র শ্রুতিমধুর বা সুবোধ্য নয়। রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন—'ভাষা মূল সংকেতমাত্র'। আমরা বিদেশী পারিভাষিক শব্দকে রূঢ়-অর্থ-বাচক সংকেত হিসাবেই গ্রহণ করব এবং তার প্রয়োগবিধি শিখব। যাঁর কৌতূহল হবে তিনি 'অক্সিজেন, অ্যান্টিমনি' প্রভৃতি নামের ব্যুৎপত্তি খোঁজ করবেন, কিন্তু সাধারণের পক্ষে রূঢ় অর্থের জ্ঞানই যথেষ্ট। জীববিদ্যাতেও ঐ নিয়ম। 'কাষ্ঠ, অস্থি, পুষ্প, অণ্ড' চলবে; 'প্রোটো-প্লাজ্‌ম, হিমোগ্লোবিন, ভাইটামিন' মেনে নিতে হবে।

৫। বর্গবাচক শব্দের প্রাচীন বা নবরচিত দেশী নাম সহজে চলবে, যথা—'ধাতু, ক্ষার, অম্ল, লবণ, প্রাণী, মেরুদণ্ডী, তৃণ'। কিন্তু যেখানেই শব্দ রচনা কঠিন হবে সেখানে বিনা দ্বিধায় ইংরেজী নাম নেওয়া উচিত। বোধ হয় বর্গের উচ্চতর অঙ্গে (element, compound, phylum, order, genus, species, endogen) দেশী নাম অনায়াসে চলবে। কিন্তু নিম্নতর অঙ্গে বহুস্থলে ইংরাজী নাম মেনে নিতে হবে, যেমন—'হাইড্রোকার্বন, অক্সাইড, গোরিলা, হাইড্রা, ব্যাকটিরিয়া'।

৬। ভাব বিশেষণ ও ক্রিয়া বাচক শব্দের অধিকাংশই দেশী হ'তে পারবে। Survival, symbiosis, reflection, polarization, density, gaseous, octahedral, decompose, effervesce প্রভৃতির দেশী প্রতিশব্দ সহজে চলবে। কিন্তু রূঢ় শব্দ ইংরেজীই নিতে হবে, যথা—'গ্রাম, মিটার, মাইক্রন, ফারাড'।

বহুস্থলে একটি ইংরেজী শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তৎসম্পর্কিত (cognate) আরও কয়েকটি শব্দ নিতে হবে। 'ফোকস, ফিনল, অক্সাইড, মিটার' এর সঙ্গে 'ফোকাল, ফিনলিক, অক্সিডেশন, মেট্রিক' চলবে। ছাপাখানার

ভাষায় যেমন 'কম্পোজ করা' চলেছে, রাসায়নিক ভাষায় তেমনি 'অক্সিডাইজ' করা চলবে।

৭। বাংলায় (বা সংস্কৃতে) কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ আছে যার ইংরেজী প্রতিশব্দ নেই, যথা — শুক্লপক্ষ, পতঙ্গ (winged insect), উন্নবৃত্ত (circle cutting equinoctial at right angles), ছায়া (both shadow and transmitted light), উপাঙ্গ (limb of a limb)। পরিভাষার তালিকার এইসকল শব্দকে সযত্নে স্থান দিতে হবে।

৮। দেশী পরিভাষা নির্বাচনকালে সর্বত্র ইংরেজী শব্দের অভিধা (range of meaning) যথাযথ বজায় রাখার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন। যদি স্থলবিশেষে দেশী শব্দের অর্থের অপেক্ষাকৃত প্রসার বা সংকোচ থাকে তবে ক্ষতি হবে না—যদি সংজ্ঞার্থ (definition) ঠিক থাকে। প্রসার, যথা—অঙ্গুলি = finger ; toe। সংকোচ, যথা = fluid—তরল ; বায়ব।

৯। বিভিন্ন বিদ্যায় প্রয়োগকালে একই শব্দের অল্পাধিক অর্থভেদ হয় এমন উদাহরণ ইংরেজীতে অনেক আছে। এরূপ ক্ষেত্রে বাংলায় একাধিক পরিভাষা প্রয়োগ করাই ভাল ; কারণ, বাংলা আর ইংরেজী ভাষার প্রকৃতি সমান নয়। যথা—sensitive (mind, balance, photographic plate)। Sensitive শব্দের সমান ব্যঞ্জনা (connotation) বিশিষ্ট বাংলা শব্দ রচনার কোনও প্রয়োজন নেই, একাধিক শব্দ প্রয়োগ করাই ভাল। পক্ষান্তরে এমন বাংলা শব্দও আছে যার সমান ব্যঞ্জনা বিশিষ্ট ইংরেজি শব্দ নেই, যেমন—'বিন্দু' = drop ; point ; spot। এস্থলে ইংরেজীর বশে একাধিক শব্দ রচনা নিষ্প্রয়োজন।

যাঁরা বাংলা পরিভাষার প্রতিষ্ঠার জন্য মুখ্য বা গৌণ ভাবে চেষ্টা করছেন, তাঁদের কাছে আর একটি নিবেদন জানিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ

করছি। সংকলনের ভার যাঁদের উপর, তাঁদের কিরকম যোগ্যতা থাকা দরকার? বলা বাহুল্য, এই কাজে বিভিন্ন বিদ্যায় বিশারদ বহু লোক চাই। তাঁদের মৌলিক গবেষণার খ্যাতি অনাবশ্যক, কিন্তু বাংলা ভাষায় দখল থাকা একান্ত আবশ্যক। যে সমিতি সংকলন করবেন, তাঁদের মধ্যে দু-চার জন সংস্কৃতজ্ঞ থাকা দরকার। এমন লোকও চাই যিনি হিন্দী-উর্দু পরিভাষার খবর রাখেন। যদি কোনও হিন্দীভাষী বিজ্ঞান-সাহিত্য-সেবী সমিতিতে থাকেন তবে আরও ভাল হয়। সর্বোপরি আবশ্যক এমন লোক যিনি শব্দের সৌষ্ঠব ও সুপ্রয়োজ্যতা বিচার করতে পারেন, বিশেষত সংকলিত সংস্কৃত শব্দের। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আহ্বানে যাঁরা পরিভাষা সংকলন করেছেন তাঁরা সকলেই সুপণ্ডিত এবং অনেকে একাধিক বিদ্যায় পারদর্শী। তথাপি বিভিন্ন সংকলয়িতার নৈপুণ্যের তারতম্য বহুস্থলে সুস্পষ্ট। Columnar, vitreous, adamantine এর প্রতিশব্দ একজন করেছেন—'স্তম্ভনিভ, কাচনিভ, হীরকনিভ'। আর একজন করেছেন—'স্তাম্ভিক, কাচিক, হৈরিক'। শেষোক্ত শব্দগুলিই যে ভাল তাতে সন্দেহ নেই। বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তাবিত শব্দের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম ও গ্রহণযোগ্য তার বিচারের ভার সাধারণের উপর দিলে চলবে না; সংকলন-সমিতিকেই তা করতে হবে। এ নিমিত্ত যে বৈদগ্ধ আবশ্যক তা সমিতির প্রত্যেক সদস্যের না থাকতে পারে, কিন্তু কয়েকজনের থাকা সম্ভব। অতএব, পরিভাষাসংকলন বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা সাধিত হ'লেও শেষ নির্বাচন মিলিত সমিতিতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়।
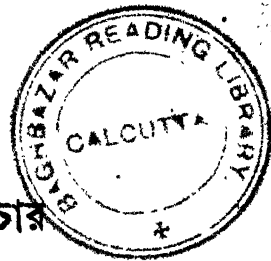
সাহিত্যবিচার

(১৩৪১)

মানুষের মন একটি আশ্চর্য যন্ত্র। কোন্ আঘাতে এ যন্ত্র কিরকম সাড়া দেয় তা আমরা অল্পই জানি। রাম একটি কড়া কথা বললে, অমনি শ্যাম খেপে উঠল; রাম একটু প্রশংসা করলে, শ্যাম খুশী হয়ে গেল। মনের এইরকম সহজ প্রতিক্রিয়া আমরা মোটামুটি বুঝি এবং তার নিয়মও কিছু কিছু বলতে পারি। কিন্তু রাম যদি ব্যক্তি বা দল বিশেষকে উদ্দেশ না ক'রে কিছু লেখে বা বলে, অর্থাৎ কবিতা গল্প প্রবন্ধ রচনা করে বা বক্তৃতা দেয়, তবে তাতে কোন্ কোন্ গুণ থাকলে সাধারণে খুশী হবে তা নির্ণয় করা সোজা নয়। পাঠক বা শ্রোতা যদি সাধারণ না হয়ে অসাধারণ হন, যদি তিনি সমঝদার রসজ্ঞ ব্যক্তি হন, তবে তাঁর বিচারপদ্ধতি কিরূপ তা বোঝা আরও কঠিন।

একটা সোজা উপমা দিচ্ছি। চা আমরা অনেকেই খাই এবং তার স্বাদ গন্ধ মোটামুটি বিচার করতে পারি। কিন্তু চা-বাগানের কর্তারা চাএর দাম স্থির করেন কোন্ উপায়ে? এখনও এমন যন্ত্র তৈয়ারী হয় নি যাতে চায়ের স্বাদ গন্ধ মাপা যায়। অগত্যা বিশেষজ্ঞের শরণ নিতে হয়। এই বিশেষজ্ঞ বিশেষ কিছুই জানেন না। এঁর সম্বল শুধু জিব আর নাক। ইনি গরম জলে চা ভিজিয়ে সেই জল একটু চেখে বলেন — এই চা দু-টাকা পাউণ্ড, এটা পাঁচ সিকে, এটা এক টাকা তিন আনা। তিনি কোন্ উপায়ে এইরকম বিচার করেন তা নিজেই বলিতে পারেন

না। তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও রসনেন্দ্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অতি অল্প ইতরবিশেষও তাঁর কাছে ধরা পড়ে। এই বিধিদত্ত ক্ষমতার খ্যাতিতে তিনি টি-টেস্‌টারের পদ লাভ করেন এবং চা-ব্যবসায়ী তাঁর যাচাইকেই চূড়ান্ত ব'লে মেনে নেয়। তিনি যদি বলেন এই চাএর চেয়ে ঐ চা ঈষৎ ভাল তবে দু-দশ জন সাধারণ লোক হয়তো অন্য মত দিতে পারে। কিন্তু বহু শত বিলাসী লোক যদি ঐ দুই চা খেয়ে দেখে তবে অধিকাংশের অভিমত টি-টেস্‌টারের অনুবর্তী হবে।

যাঁরা সাহিত্যে বৈদগ্ধের খ্যাতি লাভ করেন তাঁরা টি-টেস্‌টারের সহিত তুলনীয়। টি-টেস্‌টারের লক্ষণ — স্বাদ-গন্ধের সূক্ষ্ম বোধ আর অসংখ্য পেয়ালার সঙ্গে পরিচয়। বিদগ্ধ ব্যক্তির লক্ষণ — সূক্ষ্ম রসবোধ আর সাহিত্যে বিপুল অভিজ্ঞতা। স্বাদ গন্ধ কাকে বলে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, আমরা কেবল মনে মনে বুঝি। কিন্তু রসের স্বরূপ সম্বন্ধে মনে মনে ধারণা করাও শক্ত। সাহিত্য-বিচারককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—আপনি কি কি গুণের জন্য এই রচনাটিকে ভাল বলছেন—তবে তিনি কিছুই স্পষ্ট ক'রে বলতে পারবেন না। যদি বলতে পারতেন তবে রসবিচারের একটা পদ্ধতি খাড়া হাত পারত। তাঁর যদি বিদ্যা জাহির করিবার লোভ থাকে (থাকতেও পারে, কারণ, বিদ্যা দদাতি বিনয়ং সব ক্ষেত্রে নয়), তবে তিনি হয়তো আর্টের উপর বক্তৃতা দেবেন, অলংকারশাস্ত্র উদ্‌ঘাটন করবেন, রসের বিশ্লেষণ করবেন। সেই ব্যাখ্যান শুনে হয়তো শ্রোতা অনেক নূতন জিনিস শিখবে। কিন্তু রসবিচারের মাপকাঠির সন্ধান পাবে না।

সাহিত্যের যে রস তা বহু উপাদানের জটিল সমন্বয়ে উৎপন্ন। সংগীতের রস বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সরল। আমরা লোকপরম্পরায় জেনে এসেছি

যে অমুক স্বরের সঙ্গে অমুক স্বর মিষ্ট বা কটু শোনায়, কিন্তু কিজন্য এমন হয় তা ঠিক জানি না। বিজ্ঞানী এইটুকু আবিষ্কার করেছেন যে আমাদের কানের ভিতরের শ্রুতিযন্ত্রে কতকগুলি তন্তু আছে, তাদের কম্পনের রীতি বিভিন্ন কিন্তু নির্দিষ্ট। বিবাদী স্বরের আঘাতে এই তন্তুগুলির স্বচ্ছন্দ স্পন্দনে ব্যাঘাত হয়, কিন্তু সংবাদী স্বরে হয় না। শ্রবণেন্দ্রিয়ের রহস্য যদি আরও জানা যায় তবে হয়তো সংগীতের অনেক তত্ত্ব বোধগম্য হবে। যত দিন তা না হয় তত দিন সংগীতবিদ্যাকে কলা বা আর্ট বলা চলবে কিন্তু বিজ্ঞান বলা চলবে না।

সাহিত্যের রসতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই অস্পষ্ট। সুললিত বর্ণনার মায়াজালে এই অজ্ঞতা ঢাকা পড়ে না। কেউ বলেন—art for art's sake, কেউ বলেন—মানুষের কল্যাণই সাহিত্যের কাম্য, কেউ বলেন—সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনসাধন। এই সমস্ত ঝাপসা কথায় রসতত্ত্বের নিদান পাওয়া যায় না। আমরা এইটুকু বুঝি যে সাহিত্যরসে মানুষ আনন্দ পায়, কিন্তু রসের বিভিন্ন উপাদানের মাত্রা ও যোজনার বিষয় আমরা কিছুই জানি না। যে যে উপাদান সাহিত্যরসের উপজীব্য, তার কয়েকটি সম্বন্ধে আমরা অস্পষ্ট ধারণা করতে পারি, যথা—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের রুচিকর বিষয় বর্ণন, চিরাগত সংস্কার ও অভ্যাসের আনুকূল্য, মানুষের প্রচ্ছন্ন কামনার তর্পণ, অপ্রিয় বাধার খণ্ডন, অস্ফুট অনুভূতির পরিস্ফুটন, জ্ঞানের বর্ধন, আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি। এইসকল উপাদানের কতকগুলি পরস্পরবিরোধী, কতকগুলি নীতিবিরোধী। কিন্তু সাহিত্যরচয়িতা কোনও উপাদান বাদ দেন না। ওস্তাদ পাচক যেমন কটু অম্ল মিষ্ট সুগন্ধ দুর্গন্ধ নানা উপাদান মিশিয়ে বিবিধ সুখাদ্য তৈয়ার করে, ওস্তাদ-

সাহিত্যিকও সেই রকম করেন। খাদ্যে কতটা ঘি দিলে উপাদেয় হবে, কটা লঙ্কা দিলে মুখ জ্বালা করবে না, কতটুকু রসুন দিলে বিকট গন্ধ হবে না,—এবং সাহিত্যে কতটুকু শান্তরস বা বীভৎসরস, তত্ত্বকথা বা দুর্নীতি বরদাস্ত হবে, এসবের নির্ধারণ একই পদ্ধতিতে হয়। কয়েকজন ভোক্তার হয়তো বিশেষ বিশেষ রসে অনুরক্তি বা বিরক্তি থাকতে পারে, কিন্তু তাদের পছন্দই জগতে চরম ব'লে গণ্য হয় না। যিনি কেবল দলবিশেষের তৃপ্তিবিধান করেন অথবা কেবল সাধারণ ভোক্তার অভ্যস্ত ভোজ্য প্রস্তুত করেন, তিনি সামান্য পেশাদার মাত্র। যিনি অসংখ্য খোশখোরাকীর রুচিকে নিজের অভিনব রুচির অনুগত করতে পারেন তিনিই প্রকৃত সাহিত্যস্রষ্টা; এবং যিনি অন্যের রচনায় এই প্রভাব স্বয়ং উপলব্ধি ক'রে সাধারণকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন তিনিই সমালোচক হবার যোগ্য।

তামাক একটা বিষ, কিন্তু ধূমপান অসংখ্য লোকে করে এবং সমাজ তাতে আপত্তি করে না। কারণ, মোটের উপর তামাকে যতটা স্বাস্থ্যহানি হয় তার তুলনায় লোকে মজা পায় ঢের বেশী। পাশ্চাত্ত্য দেশে মদ সম্বন্ধেও এই ধারণা, এবং অনেক সমাজে পরিমিত ব্যভিচারও উপভোগ্য ও ক্ষমার্হ গণ্য হয়। মজা পাওটাই প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু তাতে যদি বেশী স্বাস্থ্যহানি ঘটে তবে মজা নষ্ট হয় এবং রসের উদ্দেশ্যই বিফল হয়। সাহিত্যরসের উপাদান বিচারকালে সুধীজন এবিষয়ে স্বভাবত অবহিত থাকেন। যিনি উত্তম বোদ্ধা বা সমালোচক তিনি মজা ও স্বাস্থ্য উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে রসের যাচাই করেন। তাঁর যাচাইএর নিক্তি আর কষ্টিপাথর কিরকম তা তিনি অপরকে বোঝাতে পারেন না, নিজেও বোঝেন না। তথাপি তাঁর সিদ্ধান্তে বড় একটা ভুল হয় না, অর্থাৎ শিক্ষিতজন সাধারণত তাঁর মতেই মত দেয়।

খ্রীষ্টীয় আদর্শ

(১৩৪৯)

মিত্ররাষ্ট্রসংঘ কোন্ মহাপ্রেরণায় এই যুদ্ধে লড়ছেন তার বিবরণ মাঝে মাঝে ব্রিটিশ নেতাদের মুখ থেকে বেরিয়েছে। তাঁরা অনেকবার বলেছেন—আমাদের উদ্দেশ্য Christian Idealএর প্রতিষ্ঠা। বহু অখ্রীষ্টান রাষ্ট্র ব্রিটেনের পক্ষে আছে, যেমন চীন, ভারত, মিসর, আরব। রাশিয়ার কর্তারাও খ্রীষ্টধর্ম মানেন না। এই খ্রীষ্টীয় আদর্শের প্রতিবাদ সম্প্রতি বিলাতের মুসলমানদের তরফ থেকে হয়েছে। কিন্তু তার ঢের আগে ব্রিটিশ যুক্তিবাদী আর নাস্তিক সম্প্রদায় তাঁদের আপত্তি প্রবল ভাবে জানিয়েছেন। খ্রীষ্টীয় আদর্শ বললে যদি খ্রীষ্টের উপদেশ বোঝায় তবে তাতে এমন কি নূতন বিষয় আছে যা তাঁর আগে কেউ বলে নি? ইহুদী, বৌদ্ধ, হিন্দু বা মুসলমান ধর্মে কি নীতিবাক্য নেই? বিলাতে আমেরিকায় রাশিয়ায় যাঁরা খ্রীষ্টধর্ম মানেন না তাঁদের কি উচ্চ আদর্শ নেই? 'খ্রীষ্টীয় আদর্শ' কথাটিতে ভিমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া হয়েছে। এখন ব্রিটিশ নেতারা আমতা আমতা ক'রে বলছেন—আমাদের কোনও কুমতলব নেই, তোমাদেরও উচ্চ আদর্শ আছে বই কি, সেটা খ্রীষ্টীয় আদর্শের চেয়ে খাটো তা তো বলি নি, তবে কিনা 'খ্রীষ্টীয় আদর্শ' বললে তার মধ্যে সকল সম্প্রদায়েরই উচ্চতম ধর্মনীতি এসে পড়ে। প্রতিবাদীরা এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা বলা যায় না। কিন্তু খ্রীষ্টীয় আদর্শের অন্য একটা মানে থাকতে পারে।

গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ ছিলেন না, যিশু খ্রীষ্টও খ্রীষ্টান ছিলেন না। ধর্মের যাঁরা প্রবর্তক তাঁদের তিরোধানের পরে ধীরে ধীরে বহুকাল ধ'রে ধর্মসম্প্রদায় গ'ড়ে ওঠে এবং পরিবর্তনও ক্রমান্বয়ে হ'তে থাকে। অবশেষে মঠধারী, প্রচারক, পুরোহিত এবং লোকাচার দ্বারাই ধর্ম শাসিত হয়, এবং যাঁরা আদিপ্রবর্তক তাঁরা সাক্ষিগোপাল মাত্র হয়ে পড়েন। বিলাতেও তাই হয়েছে। খ্রীষ্টীয় আদর্শ মানে খ্রীষ্টকথিত মার্গ নয়, আধুনিক প্রোটেস্টাণ্ট ধনিসমাজের আদর্শ। সে আদর্শ কি? গত দু শ বৎসরের মধ্যে বিলাতে যে সমৃদ্ধি হয়েছে তার কারণ প্রোটেস্টাণ্ট সমাজের উদ্যম। এই সমৃদ্ধির কারণ অবশ্য প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম নয়, যেমন এদেশের পারসী জাতি জরথুস্ত্রীয় ধর্মের জন্যই ধনী হন নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যাঁরা বিস্তার করেছেন এবং নিজের দেশে যাঁরা বড় বড় কারখানার পত্তন ক'রে দেশ-বিদেশে মাল চালান দিয়ে ধনশালী হয়েছেন, দৈবক্রমে তাঁরা প্রোটেস্টাণ্ট — বিশেষ ক'রে ইংল্যাণ্ডের অ্যাংলিক্যান এবং স্কটল্যাণ্ডের প্রেসবিটেরিয়ান সমাজ। ধনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিক শক্তি আসে, সেজন্য এই দুই সমাজই বিলাতে প্রবল। এঁরা চার্চের পোষক, চার্চও এঁদের আজ্ঞাবহ। গীতায় আছে—'দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ, পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ'—যজ্ঞের দ্বারা দেবগণকে তৃপ্ত কর, ঐ দেবগণও তোমাদের তৃপ্ত করুন; পরস্পরকে তৃপ্ত ক'রে পরম শ্রেয় লাভ কর। বিলাতের দেবতা বিলাতবাসীকে ঐশ্বর্যদানে তৃপ্ত করেছেন, বিলাতের লোকেরাও তাঁদের যাজকসংঘকে সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যে তৃপ্ত করে থাকেন। কিন্তু শুধু তৃপ্ত করেন না, পরোক্ষভাবে হুকুমও চালান। পার্লিমেণ্ট যেমন ধনীর করতলস্থ, চার্চও সেইরকম। পাদ্রীরা যথাসম্ভব ধনীর ইঙ্গিতে চলেন,

অবাধ্য রাজাকে সরাবার বিধান দেন, কখনও বিধর্মীর বিরুদ্ধে ক্রুসেড প্রচার করেন, কখনও বিজ্ঞানীকে ধর্মদ্রোহের অপবাদ দিয়ে শাস্তির চেষ্টা করেন, অধীন দুর্বল জাতিদের চিরস্থায়ী হেপাজত সমর্থন করেন। আমাদের দেশেও ধনী আর পুরোহিতের মধ্যে একটু ঐরকম সম্বন্ধ আছে। কিন্তু ধর্মের ভেদ এখানে বেশী, রাজশাসনও নেই, তাই 'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ' ব্যাপারটা দেশব্যাপী হয় নি।

যে খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে একটা শ্রীবৃদ্ধি জড়িত তার নামেই যে ব্রিটেনের যুদ্ধোত্তর আদর্শ ঘোষিত হবে তা বিচিত্র নয়। কিন্তু নূতন ক'রে আদর্শ স্থাপনের কারণ এ নয় যে পূর্বের আদর্শ ধর্মবিরুদ্ধ ছিল। কথাটা বিদেশীকে লক্ষ্য করে বলা হয় নি, বৃটিশ জাতিরই আত্মপ্রসাদ রক্ষার জন্য বলা হয়েছে, যাতে এই বিপৎকালে কারও মনে গ্লানি বা বৈরাগ্য না আসে। এই আদর্শের আন্তরিক অর্থ—যে উত্তম ব্যবস্থা সেদিন পর্যন্ত ইওরোপ এশিয়া আফ্রিকায় চ'লে এসেছে তাই কিঞ্চিৎ শোধনের পর পাকা করা। আদর্শটা ধূমাচ্ছন্ন, স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত করা যায় না, সেজন্য একটা পবিত্র বিশেষণ আবশ্যক। আমাদেরও অনেক ক্ষুদ্র আদর্শ আছে, এক কথায়—আমরা রামরাজ্য চাই। বিলাসী ধনী তাতে বোঝেন—তাঁর স্বত্ব সম্পত্তি নিরাপদ থাকবে, দারজিলিং সিমলা বিলাত সুগম হবে, হাবে প্রচুর সিল্ক সাটিন পেট্রল 'সার'-উপাধি সুলভ হবে, গৃহিণী পুত্র কন্যারা দুখানা মোটরেই সন্তুষ্ট থাকবেন। অতি নিরীহ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বোঝেন—তাঁর রোজগার বজায় থাকবে, ট্যাক্স বাড়বে না, দোকানদার সস্তায় জিনিসপত্র দেবে, চাকর কম মাইনেয় কাজ করবে, ছেলে-মেয়েরা আইন লঙ্ঘন বা বিয়ের আগে প্রেম করবে না। খ্রীষ্টীয় আদর্শ বা আমাদের অতি ক্ষুদ্র আদর্শ যতই প্রচ্ছন্ন হ'ক, তার মানে—যা আছে বা

ভুক্তপূর্ব তাই কায়েম করা বা আরও সুবিধাজনক করা। কিন্তু আমাদের একটা বড় আদর্শও আছে—স্বাধীনতা, যা অভূতপূর্ব, যার নকশাও তৈরি হয় নি, শুধু নামটাই সম্বল। সুতরাং কিছু উহ্য না রেখেই আমরা সে আদর্শ ঘোষণা করতে পারি, ভাবী স্বরাজ্যকে রামরাজ্য বা ধর্মরাজ্য বলবার দরকার নেই।

তৃতীয় আদর্শ যাদের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হবে তাদের মধ্যে রাশিয়া আছে। সেদিন পর্যন্ত রাশিয়া অর্ধশত্রু ছিল, এখন পরমমিত্র। কিন্তু রাজনীতিক মৈত্রী আর বারবনিতার প্রেম একজাতীয়। যখন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার সময় আসবে তখন সাম্যবাদী মিত্র কি বলবে? হয়তো বলবে—ব্রিটেন তার সাম্রাজ্য নিয়ে যা খুশি করুক, আমরা নিজের দেশ আগে সামলাই। হয়তো ব্রিটেন সেই ভরসাতেই নিজের আদর্শ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত আছে।

ভাষার বিশুদ্ধি

(১৩৫০)

মৃতভাষা যদি দৈবগতিকে জীবিত সমাজের সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হয় তবে তাতে নিয়মের বন্ধন সহজেই পড়ে। প্রাচীন লেখকদের রীতি এবং তদনুসারে সংকলিত ব্যাকরণ আর অভিধানের শাসন এরকম ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত করে, বেশী বিকার ঘটতে দেয় না। এমন ভাষা কেবল পণ্ডিতদের ভিতরেই চলতে পারে এবং অশুদ্ধির ভয়ে লেখকগণকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। জনসাধারণ সে ভাষার কৌশল বোঝে না, সেজন্য তাতে হস্তক্ষেপ ক'রে বিকৃত করে না, জীবন্ত প্রাকৃত ভাষাতেই তাদের স্থূল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। খ্রীষ্টীয় যুগের আদিতে দক্ষিণপূর্ব ইওরোপের বিভিন্নজাতীয় পণ্ডিতসমাজে গ্রীক ভাষা সাহিত্যিক ভাষারূপে প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে সমগ্র ইওরোপে ল্যাটিন ভাষা ঐরকম প্রতিষ্ঠা পায়। মুসলমান রাজত্বকাল পর্যন্ত সংস্কৃত সমগ্র ভারতের হিন্দু বিদ্বৎসমাজের সাহিত্যের ভাষা ছিল।

বর্তমান ইংরেজী প্রভৃতি ইওরোপীয় ভাষায় যে গ্রীক ও ল্যাটিন অংশ আছে তার বেশীর ভাগই বিকৃত। বিজ্ঞানের প্রয়োজনে গ্রীক ল্যাটিন উপাদানযোগে অসংখ্য পারিভাষিক শব্দ রচিত হয়েছে, কিন্তু তাদের বিশুদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয় নি। আধুনিক ইওরোপীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা অধিকাংশই dog latin অর্থাৎ বিকৃত ল্যাটিন। পণ্ডিতগণ সজ্ঞানেই এইরকম শব্দ গঠন করেছেন, আধুনিক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য

ব্যাকরণ অগ্রাহ্য ক'রে মৃতভাষার হাড় মাস চামড়া কাজে লাগাতে তাঁরা সংকোচ বোধ করেন নি। সৌভাগ্যক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পরিভাষা সংকলনে এরকম অনাচার আবশ্যক হয় নি।

প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন যে অর্থে মৃতভাষা, সংস্কৃতকে সে অর্থে মৃত বলা যায় না। সংস্কৃত বাক্য মরেছে, অর্থাৎ সাধারণে সে ভাষায় কথা বলে না, কিন্তু অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ আধুনিক সাহিত্যিক বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে বেঁচে আছে, উচ্চারণের বিকার হ'লেও রূপ বদলায় নি। আমরা শুধু প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করি না, দরকার হ'লে সংস্কৃত রীতিতেই নূতন শব্দ এবং নূতন সমাসবদ্ধ পদ রচনা করি। সংস্কৃত ভাষা বাংলার জননী কি মাতামহী তা ভাষাবিজ্ঞানীরা বলতে পারেন। সম্বন্ধ যাই হ'ক, ভাগ্যক্রমে আধুনিক বাংলা ভাষা বিপুল সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের উত্তরাধিকারিণী হয়েছে। এই অধিকারের সঙ্গে তাকে সম্পত্তিরক্ষার দায়িত্বও নিতে হয়েছে। যিনি সাহিত্য চর্চা করতে চান তাঁকে কিঞ্চিত সংস্কৃত ব্যাকরণ, অন্তত সংস্কৃত প্রাতিপদিকের গঠন ও যোজনের মোটামুটি নিয়ম শিখতেই হবে।

শব্দের প্রয়োগে অবাধ স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচার চলে না, সকলে একই নিয়মের অনুবর্তী না হ'লে ভাষা দুর্বোধ হয়, সাহিত্যের যা মূল উদ্দেশ্য— ভাবের আদান প্রদান, তা ব্যাহত হয়। অসংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে কতকটা উচ্ছৃঙ্খলতা অনিবার্য, কারণ এমন কোনও প্রবল শাসন নেই যা সকলেই মেনে নিতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত শব্দে ব্যাকরণ অভিধানের শাসন আছে। যদি আমরা মনে করি যে এই শাসন বাংলা ভাষার স্বচ্ছন্দ গতির অন্তরায় তবে মহা ভুল করব। সংস্কৃত শব্দে যে সুচিরাগত নিয়মের বন্ধন আছে সকলেই তা প্রামাণিক ব'লে মেনে নিতে পারে, তাতে ভাব

এবং তার অর্থ স্থির থাকে, কিন্তু ভাষার স্বচ্ছন্দতা কিছুমাত্র বাধা পায় না।

বাংলার তুল্য হিন্দী মারাঠী প্রভৃতি কতকগুলি ভাষাতেও সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য আছে, এবং সেই কারণেই বাংলা হিন্দী প্রভৃতি ভাষী অনায়াসে পরস্পরের ভাষা শিখতে পারে। ভারতের কয়েকটি প্রদেশের ভাষায় এই যে শব্দসাম্য আছে তা অবহেলার বিষয় নয়, এই সাম্য যত বজায় থাকে ততই সকলের পক্ষে মঙ্গল।

এদেশে ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের চর্চা অল্পসংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তাঁরা প্রায় সকলেই সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন সেজন্য তাঁদের হাতে সংস্কৃত শব্দের বিকৃতি আর অপপ্রয়োগ বেশী ঘটে নি। 'ইতিমধ্যে, মহারথী, সক্ষম, সততা, সিঞ্চন, সৃজন' প্রভৃতি কয়েকটি অশুদ্ধ শব্দ বহুকাল থেকে বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে, এখন এগুলিকে ছাড়া শক্ত, ছাড়বার প্রয়োজনও নেই। বর্তমানকালে সাহিত্য-চর্চা খুব ব্যাপক হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সকল লেখকের উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ হয় নি, তার ফলে অশুদ্ধ এবং অপপ্রযুক্ত শব্দের বাহুল্য দেখা দিয়েছে। এই উচ্ছৃঙ্খলতা উপেক্ষার বিষয় নয়। অতি বড় বিদ্বানেরও মাঝে মাঝে স্খলন হয়, কিন্তু তাতে স্থায়ী অনিষ্ট হয় না যদি তাঁরা নিজের ভুল বোঝবার পরে সতর্ক হন। কিন্তু লেখকরা যদি নিরঙ্কুশ হন এবং তাঁদের ভুল বার বার ছাপার অক্ষরে দেখা দেয় তবে তা সংক্রামক রোগের মতন সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।—

প্রামাণিক অর্থে 'প্রামাণ্য', ইতিহাস অর্থে 'ইতিকথা,' ক্ষীণ বা মিটমিটে অর্থে 'স্তিমিত', আয়ত্ত অর্থে 'আয়ত্তাধীন' চলছে। কর্মসূত্রে বা কর্মোপলক্ষ্যে স্থানে 'কর্ম ব্যপদেশে' লেখা হচ্ছে। 'উৎকর্ষতা, ঔৎকর্ষ, প্রসারতা,

সৌজন্যতা, ঐক্যতা, ঐক্যতান, উচিৎ' প্রভৃতি অদ্ভুত শব্দ চলছে। 'আধুনিকী' স্থানে 'আধুনিকা', প্রচুর অর্থে 'যথেষ্ট', সংজ্ঞার্থ বা definition অর্থে 'সংজ্ঞা' প্রায় কায়েম হয়ে গেছে। অনেকে কবিতার শ্রেণী অর্থে 'বলাকা' লিখছেন।

আজকাল সাহিত্যের প্রধান বাহন সংবাদপত্র। এই বাহনের প্রভাব কিরকম ব্যাপক হয়েছে তা সাধারণের লেখা আর কথা লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। Situation অর্থে অনর্থক 'পরিস্থিতি' লেখা হচ্ছে, যদিও 'অবস্থা' লিখলেই কাজ চলে। আইন লঙ্ঘন স্থানে 'আইন অমান্য', আলোচনা স্থানে 'আলোচনী', কার্যকর উপায় স্থানে 'কার্যকরী উপায়', পূর্বেই ভাবা উচিত ছিল স্থানে 'পূর্বাহ্ণেই···' লেখা হচ্ছে। সাংবাদিকদের অদ্ভুত ভাষা মার্জনীয়। তাঁদের রাত জেগে কাজ করতে হয়, অতি অল্প সময়ে রাশি রাশি সংবাদ ইংরেজী থেকে বাংলায় তরজমা করতে হয়, ভাষার বিশুদ্ধির উপর দৃষ্টি রাখবার সময় নেই, তাঁদের ভাষা ইংরেজীগন্ধী হওয়া বিচিত্র নয়। Stalin's speech has given rise to a first class political problem—'স্টালিনের বক্তৃতা একটি প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে।' The Congress party did not take part in the discussion—'কংগ্রেসদল এই আলোচনার অংশ গ্রহণ করেন নাই।'

কিছুকাল পূর্বে একটি ইংরেজী পত্রিকায় পড়েছিলাম যে Times প্রভৃতি সংবাদপত্রের বেতনভুক্ লেখকগণকে মাঝে মাঝে শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে সতর্ক করা হয়। এদেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা হ'তে পারে। সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলের মধ্যে সুশিক্ষিত লোকের অভাব নেই। তাঁরা সহকারীদের প্রত্যেক লেখা ছাপবার আগে সংশোধন করে দেবেন এমন

আপত্তি করা অন্যায়। কিন্তু যদি তাঁরা দেখেন যে কোনও অশুদ্ধ শব্দ বা অপপ্রয়োগ বার বার ছাপা হচ্ছে তবে মাঝে মাঝে শুদ্ধাশুদ্ধির ফর্দ ক'রে দিয়ে তাঁদের অধীন লেখকদের সতর্ক ক'রে দিতে পারেন। কয়েকটি বিলাতী পত্রিকায় ভাষার বিশুদ্ধি সম্বন্ধে মাঝে মাঝে আলোচনা আর বিতর্ক ছাপা হয়। এদেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা হ'লে বাংলা সাহিত্যের কল্যাণ হবে।

তিমি

(১৩৪৯)

আধুনিক প্রাণীদের মধ্যে তিমি সব চেয়ে বড়। এই জন্তুটি মহাকায়, কিন্তু সাধারণত ক্ষুদ্রভোজী, ছোট ছোট মাছ শামুক ইত্যাদি খেয়েই জীবনধারণ করে। পুরাণে আর একরকম জলজন্তুর উল্লেখ আছে— তিমিংগিল, যারা এত বড় যে তিমিকে গিলে খায়। পৌরাণিক কল্পনা এখানেই নিরস্ত হয় নি, তিমিংগিলেরও ভক্ষক আছে, যার নাম তিমিংগিলগিল। ততোধিক গিলগিলান্ত নামধারী জন্তুরও উল্লেখ আছে। পুরাণকর্তাদের প্রাণিবৃত্তান্ত যতই অদ্ভুত হ'ক, তাঁরা মাৎস্য ন্যায় বা power politics বুঝতেন।

জন্তুর মধ্যে যেমন তিমি, দেশের মধ্যে তেমন আফ্রিকা, ভারত, চীন, ইণ্ডোচীন প্রভৃতি। এসব দেশ আকারে বৃহৎ, কিন্তু ক্ষুদ্রভোজী অর্থাৎ অল্পে তুষ্ট। এদের অল্পাধিক পরিমাণে কবলিত ক'রে যারা সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে তারা তিমিংগিল জাতীয়; যেমন ব্রিটেন, ফ্রান্স, হলাণ্ড, ইটালি, জাপান। এইরকম পরদেশগ্রাস বহু যুগ থেকে চলে আসছে, অবশ্য কালক্রমে গ্রস্ত আর গ্রাসকের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেকালের তিমিংগিলরা সরলস্বভাব ছিল, তারা বিনা বাক্যব্যয়ে গিলত, কোনও সাধু সংকল্পের দোহাই দিত না। রোমান, হুন, তুর্ক, মোগল প্রভৃতি বিজেতারা এই প্রকৃতির। এই গ্রসননীতি প্রাচীন ভারতেও কিছু কিছু ছিল, শরৎকাল পড়লেই পরাক্রান্ত রাজারা খামকা দিগ্‌বিজয়ে বার

হতেন। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশের দৌড় ছিল সংকীর্ণ, আশে-পাশের গোটাকতক রাজ্য করায়ত্ত ক'রেই নিজেকে সসাগরা ধরার অধীশ্বর ঘোষণা করতেন।

আধুনিক তিমিংগিলদের চক্ষুলজ্জা আছে, তারা স্বজাতির সমালোচনাকে কিঞ্চিৎ ভয় করে। তাই শ্বেতজাতির বোঝা, সভ্যতার বিস্তার, অনুন্নত দেশের উন্নতি, শান্তি ও সুনিয়ম প্রভৃতি বড় বড় কথা শোনা যায়। এই সব নীতিবাক্যে তিমিংগিলদের আত্মপ্রসাদ বজায় থাকে, তাদেব মধ্যে যারা একটু সন্দিগ্ধ তারাও বেশী আপত্তি তুলতে পারে না। এই ধর্মধ্বজী তিমিংগিল সম্প্রদায়ের আধিপত্য এত দিন অবাধে চলছিল, কিন্তু সম্প্রতি একশ্রেণীর নবতর জীব গোলযোগ বাধিয়েছে, এরা তিমিংগিলগিল, যথা জার্মনি ও জাপান। এরা ভাবে — পৃথিবীতে যত তিমি আছে সবই তো তিমিংগিলদের কবলে, আমরা খাব কি? অতএব প্রচণ্ড মুখব্যাদান ক'রে তিমিংগিলদেরই গ্রাস করতে হবে। তাতে প্রথমটা যতই কষ্ট হ'ক অবশেষে যা পাওয়া যাবে তা একবারে তৈরী সাম্রাজ্য, অন্যের চর্বিত খাদ্যের পুনশ্চর্বণ দরকার হবে না, মুখে পুরলেই পুষ্টিলাভ হবে। জার্মনি চায় সমস্ত ইওরোপ, জাপান চায় সমস্ত পূর্ব এশিয়া—পশ্চিম এশিযা কার ভক্ষ্য হবে তা এখনও নির্ধারিত হয় নি। অবশ্য এর পর দুই গিলগিলের মধ্যেও বিবাদ বাধতে পারে। বিজয়ী জার্মনি যদি ফ্রান্স আর হলাণ্ড কবলস্থ ক'রেই রাখে তবে এই দুই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ইণ্ডোচীন জাভা প্রভৃতি জাপানকে খোশমেজাজে ছেড়ে দেবে না। যদি এশিয়ার ঐশ্বর্য না মেলে তবে এমন মরণপণ যুদ্ধের সার্থকতা কি? বোধ হয় জার্মনি মনে করে যে ব্রিটেন আর আমেরিকাকে জব্দ করার পর জাপানকে সাবাড় করা অতি সহজ কাজ। সম্প্রতি

একজন ব্রিটিশ জাঁদরেল, বলেছেন জাপানীরা বানর মাত্র। জার্মানিও মনে মনে তাই বলে। অবশেষে হয়তো কণ্টকেনৈব কণ্টকম্ উৎপাটিত হবে। ইটালি বেচারা উভয়সংকটে পড়েছে। সেও গিলগিল হ'তে চেয়েছিল, কিন্তু এখন তার গিলত্বও যেতে বসেছে। জার্মানি যদি জেতে আর দুই একটা হাড় ছুড়ে দেয় তবেই তার মুখরক্ষা হবে।

তিমিংগিলগিলদের চক্ষুলজ্জা নেই, কিন্তু তাদের ব্রত আরও মহৎ। জার্মানি বলে — সমগ্র পৃথিবী অতিমানব আর্যজাতির (অর্থাৎ তার নিজের) শাসনে আসবে এই হচ্ছে বিধাতার বিধান। জাপান একটু মোলায়েম সুরে বলে — হে এশিয়ার নির্যাতিত জাতিবৃন্দ, আমাদের পতাকাতলে এসে আমাদের সঙ্গে সমান সমৃদ্ধি লাভ কর।

মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রনেতাদের যুদ্ধোত্তর সংকল্প কি তা স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত হয় নি। ভারতবর্ষে আমেরিকার কোনও প্রত্যক্ষ স্বার্থ নেই। এদেশের সংবাদপত্রে আমেরিকান প্রেসিডেন্টের যে বাণী ঘোষিত হয়েছে তাতে চতুর্বিধ আশ্বাস আছে—বাক্য ও ধর্মের স্বাধীনতা, অভাব ও ভয় থেকে মুক্তি। কিন্তু যে স্বাধীনতা সকলের মূল তার উল্লেখ নেই। অস্পষ্ট উক্তির একটা কারণ—সংকল্পই স্থির হয় নি। আর একটা কারণ— এই সংকটকালে নিজের আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে বন্ধুবর্গ চটতে পারে অথবা পরাধীন প্রজারা চঞ্চল হ'তে পারে। তথাপি ব্রিটেন আর আমেরিকার দুচারজন উচ্চাদর্শবাদী মাঝে মাঝে উদার কথা ব'লে ফেলেছেন, — যথা, কোনও দেশ পরাধীন থাকবে না, স্বভাবজাত সম্পদে কোনও রাষ্ট্রের একচেটে অধিকার থাকবে না, সমগ্র মানবজাতির হিতসাধনই একমাত্র লক্ষ্য, জাপানী সহসমৃদ্ধি নয়, সার্বজাতিক সহসমৃদ্ধি।

উত্তম সংকল্প। কিন্তু জগতে ধর্মরাজ্যস্থাপনের ভার যাঁরা নেবেন তাঁদের কার্যক্রম কি? অপ্রতিহিত ক্ষমতা হাতে পেলে তাঁদের মতিগতি কি হবে বলা যায় না। ধরা যাক তাঁরা নিষ্কাম, সমদর্শী, সর্বলোকহিতৈষী, তথাপি মানুষের বর্তমান অভিজ্ঞতা আর সাধারণের বুদ্ধির বশেই তাঁরা চলবেন এবং ভুলও করবেন। তাঁদের পন্থা কল্পনা ক'রে দেখা যেতে পারে।

তাঁদের প্রথম করণীয় হবে—পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে নিজের সুবুদ্ধি দান করা। সম্রাট অশোক সিরিয়া ইজিপ্ট গ্রীস প্রভৃতি দেশবাসীর হিতার্থে ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। এই প্রচারের অন্তরালে কোনও দুরভিসন্ধি ছিল না, অশোকের দূতরা বিদেশে রাজ্যস্থাপন করে নি, নিগৃহীতও হয় নি। অনেক ইওরোপীয় রাষ্ট্র থেকেও পররাজ্যে প্রচারক গেছে, কিন্তু বহু স্থলে পরিণাম অন্যরকম হয়েছে। 'Germany acquired the province of Shantung in China by having the good fortune to have two missionaries murdered there (Bertrand Russel).' অশোক শুধু ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করেছিলেন সেজন্য বাধা পান নি। কিন্তু বিশ্বরাষ্ট্রসংস্কারকদের উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের আর্থিক ও রাজনীতিক উন্নতিসাধন, সুতরাং স্বার্থের সংঘাত হবে এবং বাধা ঘটবে। সদুপদেশ বা propagandaই প্রকৃষ্ট পন্থা, কিন্তু যেখানে তা খাটবে না সেখানে প্রহারই সনাতন উপায়, কারণ লোকের মত পরিবর্তনের জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করা চলবে না। প্রহার অবশ্য নিষ্কামভাবে সর্বজনহিতার্থে দেওয়া হবে, যেমন বাপ দুষ্ট ছেলেকে দেয়। তার পর কি হবে তা রাজনীতিক নেতাদের আধুনিক উক্তি থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে, যথা—দুরন্ত জাতির সংযমন, নাবালক

জাতির শিক্ষক ও রক্ষক নিয়োগ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, যুদ্ধোপকরণের সংকোচ, প্রাকৃতিক সম্পদের ন্যায্য বিভাগ, নূতন আর্থনীতিক ব্যবস্থা, ইত্যাদি।

সব দেশ সমান নয়, সব মানুষও সমান নয়। এই অসামঞ্জস্য দূর করার উপায় — সর্বদেশের ঐশ্বর্য সর্বমানবের ভোগযোগ্য করা এবং সর্বজাতিকে সমান শিক্ষিত করা। কিন্তু প্রথম উপায়টি সাধ্য হ'লেও দ্বিতীয়টি সহজ নয়। সকলের জ্ঞানার্জনক্ষমতা সমান না হ'তে পারে, ক্ষমতা সমান হ'লেও শিক্ষাকালের বিলক্ষণ তারতম্য হ'তে পারে। কোনও ধনী লোকের যদি পাঁচটি ছেলে থাকে তবে সমান সুযোগ পেলেও সকলে সমান কৃতী হয় না। বাপ যত দিন বেঁচে থাকেন তত দিন অপক্ষপাতে সকলকে সুখে রাখতে পারেন, কিন্তু তাঁর অবর্তমানে অকৃতীরা কষ্ট পায়। অতএব বাপের বেঁচে থাকা দরকার। কিন্তু সমস্ত মানব-জাতির পিতৃস্থানীয় কে হবে? যাঁরা সংস্কার আরম্ভ করবেন তাঁরা চিরকাল বাঁচবেন না, কোনও দলের দীর্ঘপ্রভুত্বও লোকে সইবে না। মনু প্রজাপতি, রাজচক্রবর্তী, ডিক্‌টেটার, অ্যারিস্টোক্রাসি, অলিগার্কি, প্রভৃতি সমস্তই এখন অচল। ডিমোক্রাসির উপর এখনও সাধারণের আস্থা আছে, কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে জনকতক স্বার্থপর ধূর্ত লোকেই সকল দেশের রাষ্ট্রসভায় প্রবল হয়। এই দোষের প্রতিকার হবে যদি নির্বাচকমণ্ডল (অর্থাৎ জগতের বহু লোক) সাধু ও জ্ঞানবান হয়। শিক্ষার প্রসার হ'লে জ্ঞান বাড়বে, কিন্তু সাধুতা? এইখানেই প্রবল বাধা।

সম্প্রতি Geoffrey Bourne একটি বই লিখেছেন—'Return to Reason'। এই বহুপ্রশংসিত বইটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে—ডাক্তার উকিল

প্রভৃতির মতন পার্লিমেণ্টের সদস্যকেও আগে উপযুক্ত শিক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হবে, শুধু বাগ্মী আর দলবিশেষের প্রতিনিধি হ'লে চলবে না। কিন্তু কেবল বিদ্যাশিক্ষায় সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি দূর হয় না, সাধুতাও আসে না।

সংঘবদ্ধ চেষ্টায় এবং বিজ্ঞানবলে বহু দেশ সমৃদ্ধ হয়েছে, সভ্যতা বেড়েছে, রোগ কমেছে। কিন্তু এসবের তুলনায় মানুষের চারিত্রিক উন্নতি যা হয়েছে তা নগণ্য। যেটুকু হয়েছে তা প্রাকৃতিক নিয়মে মন্থর অভিব্যক্তির ফলে, এবং পুণ্যাত্মা, কবি ও সাহিত্যিকগণের প্রভাবে, রাষ্ট্রের বা বিজ্ঞানীর নিয়ন্ত্রিত চেষ্টায় হয় নি। বিজ্ঞানের প্রেরণা এসেছে মুখ্যত মানুষের স্বাভাবিক কৌতূহল থেকে এবং গৌণত ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা থেকে। অথচ যে স্বার্থ সর্বাপেক্ষা ব্যাপক তা বিজ্ঞান কর্তৃক উপেক্ষিত হয়েছে। চরিত্রতত্ত্ব বিজ্ঞানের বহির্ভূত নয়। ব্যক্তির চরিত্র শোধিত না হ'লে সমষ্টির পরম স্বার্থজ্ঞান আসবে না, নিষ্কলুষ প্রজাতন্ত্র তথা বিশ্বরাষ্ট্রব্যবস্থাও হবে না। সাম্রাজ্যবাদীরা মাঝে মাঝে enlightened self-interest এর কথা বলেন, তার মানে — অধীন প্রজাকে বেশী শোষণ না ক'রে এবং প্রতিপক্ষকে লাভের কিছু অংশ দিয়ে সুদীর্ঘকাল নিজের স্বার্থ বজায় রাখা। এরকম ক্ষুদ্র কুটিল নীতিতে জাতিবিরোধ দূর হয় না। সমস্ত মানবজাতির মঙ্গলামঙ্গল একসঙ্গে জড়িত—এই উজ্জ্বল স্বার্থবুদ্ধির প্রসার না হ'লে সব ব্যবস্থাই পণ্ড হবে।

প্রার্থনা

(১৩৫০)

রাম চাকরির জন্ত দরখাস্ত পাঠিয়েছে। রামের মা তার মাথার একটি টাকা ঠেকিয়ে মনে মনে মা-কালীর কাছে মানত জানিয়ে টাকাটি বাক্সে তুলে রাখলেন। এই মানত যদি ভাবায় বিস্তারিত করা যায় তবে এইরকম দাঁড়ায়।—হে মা কালী, চাকরিটি আমার রামকে দিও। ছেলের বিয়ে দিয়েছি, এখন রোজগার না করলে চলবে কেন। মা, আমি শুধু হাতে তোমার কাছে আসি নি, এই দেখ একটি টাকা নজর দিচ্ছি। আমার ছেলে প্রথম মাইনে পেলেই তা থেকে যা পারি খরচ ক'রে তোমার পুজো দেব, এই টাকাটি তারই বায়না।

সম্ভবত রামের মায়ের মনের কথা শুধু এইটুকু, কিন্তু যদি সাবধানে জেরা করা হয় তবে তাঁর অন্তরের গহন প্রদেশ থেকে আরও কিছু বার হবে। এই জেরা আপনার আমার সাধ্য নয়, কারণ রামের মা ধর্মশীলা, ঠাকুর দেবতার ব্যাপারে কোনও আজগবী প্রশ্ন করলেই তিনি খেপে উঠবেন। তাঁকে জেরা করতে পারেন কেবল একজন, স্বয়ং মা-কালী। দেবীকৃত প্রশ্নের অর্থ বোঝবার শক্তি হয়তো রামের মায়ের নেই, তিনি থাবড়ে গিয়ে বলতে পারেন — মা, আমি মুখ্যু মানুষ, কি বলছ কিছুই বুঝছি না, অপরাধ নিও না। ধ'রে নেওয়া যাক যে মা-কালী নাছোড়বান্দা, তিনি রামের মায়ের

যোষণন্য তাথার সেবা করছেন এবং আমাদের যোষণন্য তাথার তা প্রকাশ করছেন।—

হাঁগা রামের মা, ওই যে টাকাটা ছেলের মাথায় ঠেকিয়ে তুলে রাখলে, ওটা কার জন্তে?

তোমারই জন্তে মা। শুধু একটি টাকা নয়, চাকরিটি হ'লে আরও অনেক কিছু দেব।

চাকরি যদি না হয় তা হ'লেও টাকাটা আমায় দেবে তো?

তা কি আর দিতে পারি মা, গরিব মানুষ। চাকরিটি হ'লে পায়ে লাগবে না।

ও, আমাকে লোভ দেখাবার জন্ত টাকাটা বার করেছ?

সেকি কথা মা। এই যে দরখাস্ত করা ইস্তক রোজ মন্দিরে গিয়ে শ্রীচরণে পাঁচটি ক'রে পঞ্চমুখী জবাফুল দিচ্ছি তা তো আর ফেরত নেব না।

চাকরি না হ'লেও রোজ ফুল দিয়ে যাবে?

তা কোথেকে দেব মা, পাঁচটি ফুল ছ পয়সা।

ও, এই ফুলগুলো আমাকে ঘুষ দিচ্ছ?

ঘুষ বলতে নেই মা, বল পূজো।

আচ্ছা রামের মা, শুনেছ বোধ হয় যে এই চাকরিটার জন্ত দু হাজার দরখাস্ত পড়েছে। তোমাদের তো কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে, যেমন ক'রে হ'ক চ'লে যাচ্ছে। কিন্তু রামের চেয়ে গরিব উমেদার অনেক আছে, তাদের কেউ যদি চাকরিটি পায় তবে খুশী হও না?

[illegible] যে ছিষ্টিছাড়া কথা মা। থাকলই বা গরিব উমেদার, আমার ছেলে আগে না যেদো মেধো আগে?

আচ্ছা, ওই যে চৌধুরীরা আছে, মস্ত বড়লোক, তাদের মেজো ছেলে হারু যদি চাকরিটা পায় তো কেমন হয়? তার মা এর মধ্যেই ঘটা ক'রে আমার পূজো দিয়েছে।

তা হেরোকে চাকরি দেবে বইকি মা, তারা যে বড়লোক, তোমাকে অনেক ঘুষ খাইয়েছে।

অর্থাৎ তোমার ঘুষ খেয়ে যদি আর সবাইকে ফাঁকি দিই তাতে তুমি খুশী হবে, আর যদি অন্যের ঘুষ খেয়ে তোমাকে ফাঁকি দিই তবে চটবে। আচ্ছা, এত লোক যখন উমেদার, আর অনেকেই আমার কাছে মানত করেছে, তখন চাকরিটা কাকে দেওয়া যায় বল তো? একচোখো হয়ে রামকেই দিতে বল নাকি?

তাই বলছি মা।

কিন্তু সকলেই তো একচোখো হ'তে বলছে, কার দিকে চোখ দেব?

অত শত জানি না মা, যা ভাল বোঝ কর।

তাই তো চিরকাল করি।

চারুবালা শিক্ষিতা মহিলা, রামের মায়ের মতন তাঁর অন্ধ সংস্কার নেই। তিনি আগে ভগবানের খোঁজখবর নিতেন না, কিন্তু সম্প্রতি বিপদে প'ড়ে প্রার্থনা করছেন।—ভগবান, আমার স্বামীকে রোগমুক্ত কর। লোকটা আমাকে অনেক জ্বালিয়েছে, কিন্তু এখন আর আমার কোনও রাগ নেই, সে সেরে উঠুক—শুধু এইটুকুই চাই। যদি ম'রে যায় তবে আমার সর্বনাশ হবে, ছেলেমেয়েরা খাবে কি? গয়না বাড়ি

জিনিসপত্র সব বেচে ফেলতে হবে। দয়াময়, আমি অন্যায় আবদার করছি না, কাকেও বঞ্চিত ক'রে নিজের ভাল চাচ্ছি না। শুধু আমার স্বামীকে সারিয়ে দাও, তাতে বিশ্বসংসারের কোনও ক্ষতি হবে না। ✽

এবারেও সওয়াল-জবাব আমরা কল্পনা করতে পারি।—

আচ্ছা চারুবালা, তুমি কি ক'রে জানলে যে তোমার স্বামী বেঁচে উঠলে কারও ক্ষতি হবে না? সে মরলেই তার চাকরিটা যোগেন ঘোষাল পাবে, বেচারা অনেক কাল আশায় আশায় আছে। আর তোমাদের এই বাড়িটার উপর চৌধুরীদের নজর আছে, তোমরা নিরুপায় হ'লেই তারা সস্তায় কিনে নেবে।

ভগবান, এমন সাংঘাতিক কথা বলতে তোমার মুখে বাধল না?

কিছুমাত্র না। তুমি এই যে রেশমী শাড়িটা প'রে আছ তার জন্য কতগুলো পোকার প্রাণ গেছে জান?

পোকার আবার প্রাণ! লক্ষ পোকার প্রাণের চেয়ে আমার একটু সাধ আহ্লাদ কি বড় নয়?

নিশ্চয়ই বড়। আমার সাধ আহ্লাদও কোটি কোটি মানুষের প্রাণের চেয়ে বড়।

পোকা মরলে আমার একটি চমৎকার শাড়ি হয়। মানুষ মরলে তোমার কি লাভ হয় শুনি?

তোমার তা বোঝবার শক্তি নেই। পোকা কি শাড়ির মর্ম বোঝে?

কি নিষ্ঠুর! লোকে তোমাকে দয়াময় বলে কেন?

তুমিও তো একটু আগে দয়াময় ব'লে ডাকছিলে, তোমার স্বামীর যদি মৃত্যু হয় তা হ'লেও দয়াময় ব'লে ডাকবে। হয়তো আশা কর যে বার বার দয়াময় বললে সত্যই আমার দয়া হবে।

সংকটে পড়লে অধিকাংশ লোকের দৈবের উপর নির্ভর বাড়ে। অশিক্ষিত জন কবচ মাদুলি হোম স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতির শরণ নেয়, শিক্ষিত জন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। সাধারণের ধারণা, মাদুলি স্বস্ত্যয়নের মতন প্রার্থনারও একটা শক্তি আছে। হোমিওপ্যাথি-ভক্তরা ব'লে থাকেন, যদি ঠিক মতন ওষুধ পড়ে তবে রোগ সারতেই হবে। প্রার্থনাবাদীরা বলেন, যদি ডাকার মতন ডাকতে পার তবে ভগবানকে সাড়া দিতেই হবে। বিশ্বাসের সঙ্গে লজিক বা স্ট্যাটিস্টিক্সের সম্পর্ক নেই। যে বিশ্বাসী সে আশা করে যে তার ওষুধ বা প্রার্থনাটি লাগসই হ'তেও পারে।

যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তুকতাক অথবা প্রার্থনা করা হয় তা ন্যায্য কি অন্যায্য ভাববার দরকার হয় না। সেকালে ডাকাতরা যাত্রার আগে কালীপূজা করত। উচ্চাটন মারণ প্রভৃতি অভিচারের চলন এখনও আছে। যারা বিপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মকদ্দমা আনে তারাও দেবতার কাছে মানত করে। যে ছাত্র পরীক্ষায় প্রথম হ'তে চায়, যে লোক দু হাজার উমেদারকে নিরাশ ক'রে চাকরিটি বাগাতে চায়, যে মেয়ে প্রতিযোগিনীদের হারিয়ে দিয়ে সদ্যআগত আই. সি. এসকে গাঁথতে চায়, তাদেরও অনেকে প্রার্থনা করে বা দৈবশক্তির শরণ নেয়। এরা কেউ মন্দ লোক নয়; রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি—এই প্রার্থনা সাধারণ মানুষের পক্ষে খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এমন ধারণা কারও নেই যে ভগবান ন্যায়বিচার করবেন, যোগ্যতম ব্যক্তিকেই করুণা করবেন। অধর্মের জয় আর ধর্মের পরাজয় যখন প্রত্যহ ঘটতে দেখা যাচ্ছে তখন ন্যায়-অন্যায়ের চিন্তা না ক'রে স্বার্থসিদ্ধির জন্য

ভগবানকে ধরতে দোষ কি? যদি মাদুলি বা স্বস্ত্যয়ন বা প্রার্থনার মাহাত্ম্য থাকে তবে উদ্দেশ্য ভাল কি মন্দ তা ভাববার দরকার নেই।

সাধারণত ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই দৈবসাহায্য চাওয়া হয়, কিন্তু বিপদ যখন দেশব্যাপী হয় তখন লোকে সমবেতভাবে দেবতাকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করে। প্লেগ বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর সময় হোমযাগ নগরসংকীর্তন, মন্দিরাদিতে বিশেষ উপাসনা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। গভর্মেণ্ট এসব ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকেন, কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের মহাভয়ে গভর্মেণ্টেরও নাস্তিক্য দূর হয়েছে। মাঝে মাঝে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল প্রজার উপর হুকুম আসে অমুক দিনে সকলে মিলে নিজ নিজ ধর্ম অনুসারে ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা কর। সম্ভবত গভর্মেণ্টের কর্ণধারগণ বিশ্বাস করেন যে ভগবান এত লোকের অনুরোধ ঠেলতে পারবেন না, অথবা মনে করেন যে ভগবানের দয়া না হ'লেও প্রজার মনে কতকটা ভরসা আসবে।

আমাদের দেশে অল্পস্বল্প পাষণ্ড আছে, কিন্তু তারা সংযত, বেশী কথা বলতে সাহস করে না। বিলাত সর্ববিষয়ে স্বাধীন দেশ, সেজন্য সেখানকার পাষণ্ডদের মুখের বাঁধন নেই। সেখানে গির্জায় গির্জায় যুদ্ধজয়ের জন্য নিয়মিত প্রার্থনা ছাড়াও সরকারী হুকুমে বিশেষ বিশেষ দিনে বড় রকম উপাসনা হয়। বিলাতী পাষণ্ডরা বলে — এ বড় আশ্চর্য কথা, যখনই বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা হয় তখনই বোমাবর্ষণ বাড়ে, আর যে গির্জায় বেশী উপাসনা হয় বেছে বেছে তাতেই বোমা পড়ে। আমাদের পাদ্রীরা ভগবানের কাছে শত্রুপক্ষের নামে অনেক লাগাচ্ছেন, আর আমরা যে নির্দোষ, অনিচ্ছায় যুদ্ধে নেমেছি, একথাও বার বার বলছেন। কিন্তু শত্রুপক্ষের পাদ্রীরাও তো ঠিক এইরকম বলছে, আমাদের

দু-তিন শ বৎসরের অপকর্মের ফর্দ ভগবানকে শুনিয়ে শুনিয়ে তাঁর কান ভারী করছে। ভগবান কার কথা শুনবেন?

বিলাতের যাজকসম্প্রদায় খুব সতর্ক। তাঁরা বোঝেন যে তাঁদের অনেক যজমান এখন স্বজাতির সমালোচনা করে এবং স্পষ্ট কথা বলে, সুতরাং ভগবানের কাছে এই বাঁধাধরা মামুলী মন্ত্রে প্রার্থনা করা আর চলবে না।—'Save and deliver us, we humbly beseech Thee, from the hands of our enemies; abate their pride, assuage their malice, and confound their devices; that we, being armed with Thy defence, may be preserved evermore from all perils, to glorify Thee, who art the giver of all victory!' সুন্দর রচনা, কিন্তু সরল আর নিষ্পাপ না হ'লে কি এমন প্রার্থনা করা চলে?

সম্প্রতি আর্কবিশপ অভ ক্যাণ্টারবেরি এক বক্তৃতায় বলেছেন, আমরা এ প্রার্থনা করব না — ঈশ্বর, আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ কর; শুধু বলব— তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক। আমাদের প্রার্থনা সমস্ত জগতের হিতার্থ, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই তা করব, নিজের ইচ্ছাপূরণের জন্য নয়।

পাষণ্ডরা এতেও ঠাণ্ডা হয় না। বলে — ঈশ্বর তোমাদের তোয়াক্কা রাখেন না, তোমরা প্রার্থনা কর আর না কর, তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবেই।

পাদ্রীদের কাছে যুক্তি আশা করা বৃথা, তাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শাসনতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত, সুতরাং আবশ্যক মত তাঁদের কূটনীতি আশ্রয় করতে হয়। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক—এই প্রার্থনা অতি পুরাতন,

বহু দেশের ভক্ত আর জ্ঞানী বহু ভাষায় এই বাক্য বলেছেন। কিন্তু সাধারণ প্রয়োগে এর মূল অভিপ্রায় লুপ্ত হয়েছে।

সামান্য লোকে (মায় বেতনভুক্‌ যাজক) যখন এই বাক্যটি বলে তখন জানাতে চায় যে ভগবানের ইচ্ছাই তার ইচ্ছা। হিন্দুর অনেক ক্রিয়া-কর্মে কর্মফল বাক্যত শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করা হয়। কিন্তু স্বার্থকামনা সর্বত্রই উহ্য থাকে। আশ্রিত জন যখন ক্ষমতাশালী প্রভুকে তুষ্ট ক'রে কাজ উদ্ধার করতে চায় তখন বলে — হুজুরের উপর কথা বলবার আমি কে? হুজুর সবই বোঝেন, সব খবর রাখেন, এই গরিবের অবস্থাটা ভাল রকমই জানেন। আপনার দ্বারা কি অবিচার হ'তে পারে? যা হুকুম করবেন মাথা পেতে নেব। আমাদের কথকঠাকুররাও দরবারী ভাষা জানেন, তাঁরা বিপন্ন প্রহ্লাদকে দিয়ে বলান — আমি মরি তাহে ক্ষতি নাহি হে, তোমার দয়াময় নামে যে কলঙ্ক হবে! ভগবানকে যখন বলা হয় — তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক, তখন সাধারণ প্রার্থীর মনে এই গূঢ় কামনা থাকে — ভগবান আমার ইচ্ছা অনুসারেই কাজ করুন।

এই প্রার্থনাবাক্য যাঁদের মুখ থেকে প্রথমে বেরিয়েছিল তাঁদের কোনও প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় ছিল না। নিষ্কাম ভক্ত এবং জ্ঞানী এখনও বলেন— তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক। এই বাক্যে কিছু রূপক আছে, বক্তার বিশ্বাস অনুসারে তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা হ'তে পারে। কিন্তু রূপকের আবরণ ভেদ করলে শুধু এই অর্থই পাওয়া যায়—আমি অভীষ্টসাধন বা বিপদ্‌বারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমার সফলতা বা বিফলতা দৈবাধীন অর্থাৎ অজ্ঞাতপূর্ব, যা ঘটবে তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা বা বিধাতার বিধান বা নিয়তি। সেই নিয়তি মেনে নেবার এবং সইবার শক্তি আমার আসুক। তার জন্যই প্রার্থনা করছি, অর্থাৎ উদ্‌বুদ্ধ হবার জন্য বার বার

নিজেকেই বলছি — হে আমার আত্মা, ক্ষুদ্রতা পরিহার কর, সুখদুঃখে লাভালাভে জয়াজয়ে অবিচলিত থাক, বিশ্বাত্মার যে সর্বব্যাপী সমদৃষ্টি তা তোমাতে সঞ্চারিত হ'ক।

সংকেতময় সাহিত্য

(১৩৫০)

যে আবিষ্কার বা উদ্‌ভাবন আমাদের সমকালীন তার মূল্য আমরা সহজে ভুলি না। রেলগাড়ি টেলিফোন মোটর সিনেমা রেডিও প্রভৃতির আশ্চর্যতা এখনও আমাদের মন থেকে লুপ্ত হয় নি। আধুনিক সভ্যতার এইসব ফল ভোগ করছি ব'লে আমরা ধন্যজ্ঞান করি, যদিও মনের গোপন কোণে একটু দীনতাবোধ থাকে যে উদ্‌ভাবনের গৌরব আমাদের নয়।

কিন্তু যে আবিষ্কার অত্যন্ত পুরাতন, কিংবা যে বিষয়ের পরিণতি প্রাচীন কালের বহু মানবের চেষ্টায় ধীরে ধীরে হয়েছে, তার সম্বন্ধে এখন আর আমাদের বিস্ময় নেই। দীর্ঘকাল ব্যবহারে আমরা এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে তার উপকারিতা মোটর সিনেমা রেডিওর চেয়ে লক্ষগুণ বেশী হ'লেও আমরা তা অকৃতজ্ঞচিত্তে আলো বাতাসের মতই সুলভ জ্ঞান করি। আগুন, কৃষি, আর বয়নবিদ্যার আবিষ্কার কে করেছিল তা জানবার উপায় নেই। এগুলির উপর আমরা একান্ত নির্ভর করি, কিন্তু এদের অভাবে আধুনিক জীবনযাত্রা যে অসম্ভব হত তা খেয়াল হয় না। এইসব বিষয়ের চেয়েও যা আশ্চর্য, যার জন্য মানবসভ্যতা ক্রমশ উন্নতিলাভ করেছে, যার প্রভাবে শুধু ঐশ্বর্যবৃদ্ধি নয়, বুদ্ধি আর চিত্তেরও উৎকর্ষ হয়েছে, যার উপযুক্ত প্রয়োগে হয়তো একদিন সমগ্র মানবজাতি একসত্তায় পরিণত হবে—এমন একটি বিষয়ের উদ্‌ভাবন পুরাকালে হয়েছিল, এবং

তার প্রসার এখনও হচ্ছে। এই অসীমশক্তিশালী পরম সহায়ের নাম 'সাহিত্য'।

Literature শব্দের মৌলিক অর্থ — লিখিত বিষয়। 'সাহিত্য' শব্দের মৌলিক অর্থ — সহিতের ভাব বা সম্মেলন, যার ফলে বহু মানব একক্রিয়াম্বয়ী বা এক ভাবে ভাবিত হয়। এমন সার্থক আর ব্যাপক নাম বোধ হয় অন্য ভাষায় নেই। ভাব প্রকাশের আদিম উপায় অঙ্গভঙ্গী ও শব্দভঙ্গী, তার পর এল বাক্য। সুভাষিত বাক্য যখন বলা হ'ল এবং শুনে মনে রাখা হ'ল তখনই সাহিত্যের উৎপত্তি, শ্রুতি আর স্মৃতিই এদেশের প্রথম সাহিত্য। প্রথম যুগে যখন বাক্যই সম্বল ছিল তখন সাহিত্যের দেবী হলেন বাণী বা বাগ্‌দেবী। সংগীত আর লেখার উৎপত্তির পর বাগ্‌দেবী বীণাপুস্তকধারিণী হলেন। এখন সাহিত্যের দেবী রাশি রাশি মুদ্রিত পুস্তকে অধিষ্ঠান ক'রে বিশ্বব্যাপিনী হয়েছেন।

প্রথমে যখন লেখার উদ্ভাবন হ'ল তখন তার উদ্দেশ্য ছিল অতি স্থূল—নিজের জিনিস চিহ্নিত করা, সম্পত্তির হিসাব রাখা, দান-বিক্রয়াদির দলিল করা, ইত্যাদি। তার পর সংবাদ পাঠাবার জন্য চিঠির এবং রাজাজ্ঞা ঘোষণার জন্য অনুশাসনলিপির প্রচলন হ'ল। ক্রমশ লিপির প্রয়োগ আরও ব্যাপক হ'ল, যে সাহিত্য পূর্বে শ্রুতিবদ্ধ ছিল তা লিপিবদ্ধ এবং অবশেষে মুদ্রিত হওয়ায় প্রচারের আর সীমা রইল না।

মুখের কথার প্রভাব অল্প নয়, কিন্তু বেশী লোকে তা শুনতে পায় না, যার শোনে তারাও চিরদিন মনে রাখতে পারে না। লিপি আবিষ্কারের পূর্বে সকল বিদ্যাই গুরুমুখে শুনে বার বার আবৃত্তি ক'রে স্মৃতিপটে নিবদ্ধ করতে হ'ত। প্রাচীন প্রথায় শিক্ষিত টোলের পণ্ডিতদের মধ্যে এখনও স্মরণশক্তির অসাধারণ উৎকর্ষ দেখা যায়, কিন্তু শ্রুতবিদ্যা কণ্ঠস্থ করা

সাধারণ লোকের সাধ্য নয়। লেখা অক্ষয় হয়ে থাকতে পারে, দরকার হ'লেই পড়া যেতে পারে। রচয়িতার মৃত্যু হয় কিন্তু তাঁর লেখা বহু শত বৎসর পরেও জীবিত থাকে। লেখা যদি ছাপা হয় তবে তার প্রভাব সর্ব মানবসমাজে ব্যাপ্ত হ'তে পারে।

আমি একটি উত্তম কাব্য বা গল্প বা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা তথ্যমূলক গ্রন্থ পড়ছি। পড়তে পড়তে লেখকের ভাব, রসবোধ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, যুক্তি, আর জ্ঞান আমাতেও সঞ্চারিত হচ্ছে। লেখক যা অনুভব করেছেন, কল্পনা করেছেন, দেখেছেন, বা জেনেছেন, আমিও তা যথাসাধ্য উপলব্ধ করছি। এই আশ্চর্য ব্যাপারের সাধনযন্ত্র কি? শুধুই কাগজের উপর কালির চিহ্নশ্রেণী। শ্রুতিগ্রাহ্য বাঙ্ময় সাহিত্য দৃষ্টিগ্রাহ্য সংকেতময় হয়েছে। মুখের ভাষাও সংকেত, কিন্তু মাতৃভাষা শেখবার একটা সহজ প্রবণতা আমাদের আছে। শিশুকালে কথা বুঝতে আর বলতে সহজেই শিখছি, লেশমাত্র আয়াস হয় নি। কিন্তু বাক্যের কৃত্রিম প্রতীক স্বরূপ অক্ষরমালা আয়ত্ত করতে কতই না কষ্ট পেয়েছি। প্রথমে লেখার অর্থ একবারেই অগ্রাহ্য ছিল, একমাত্র লক্ষ্য এক-একটি চিহ্নের পরিচয় এবং তার নাম। তার পর ধীরে ধীরে চিহ্নপরম্পরা আয়ত্ত হ'ল, পাঠের জন্য চেষ্টার প্রয়োজন রইল না, লিখিত বাক্যের উচ্চারণ সহজ হ'ল, অবশেষে ক্রমশ অর্থবোধ এল। শিশু রবীন্দ্রনাথ 'জল পড়ে পাতা নড়ে' পাঠ ক'রে সাহিত্যের যে প্রথম আস্বাদ পেয়েছিলেন, সকল ভাগ্যবান শিশুই তা একদিন পায়। পাখি যেমন ক'রে তার বাচ্চাকে উড়তে শিখিয়ে আকাশচারী করে, মানুষও সেই রকমে তার সন্তানকে সংকেতের প্রয়োগ শিখিয়ে সাহিত্যচারী অর্থাৎ বিদ্যার্জনের যোগ্য করবার চেষ্টা করে। উপযুক্ত শিক্ষা এবং অভ্যাসের ফলে সংকেতের কৃত্রিমতা আর

আবশ্যক হয় না, পড়া আর লেখার শক্তি ওঠা-হাঁটার মতই স্বভাবে পরিণত হয়।

এদেশে অসংখ্য হতভাগ্য অক্ষরপরিচয়েরও সুযোগ পায় না, অনেকে কোনও রকমে অক্ষর চেনে কিন্তু অর্থ বোঝে না। সামান্য লেখাপড়া শিখেও যে শক্তিলাভ হয় তার মর্ম আমরা সহজে বুঝি না, ছেলেবেলায় অনেকের সঙ্গে যা পাওয়া যায় তা তুচ্ছ মনে হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে একজন উড়িয়া ব্রাহ্মণকে যখন রাঁধবার কাজে বাহাল করি তখন সে একটাকা বেশী মাইনে চেয়েছিল, কারণ সে চতুঃশাস্ত্রে পণ্ডিত। জানতে চাইলাম কি কি শাস্ত্র। উত্তর দিলে — পড়তে জানি, লিখতে জানি, যোগ দিতে পারি, এ-বি-সি-ডি চিনি। লোকটির শাস্ত্রজ্ঞান যতই অল্প হ'ক, সে তার নিরক্ষর আত্মীয়স্বজনের তুলনায় শিক্ষিত — এই অসামান্যতার গৌরব সে বুঝেছিল।

স্মরণশক্তি এবং বিচারশক্তির সাহায্যের জন্য মানুষ নানারকম প্রতীক বা সংকেতের উদ্ভাবন করেছে। পদার্থবিজ্ঞানী তাঁর আলোচ্য পদার্থের ধর্ম ও সম্বন্ধের প্রতীক স্বরূপ বিবিধ অক্ষর প্রয়োগ করেন। রসায়নী শাখাপ্রশাখাময় ফরমুলার দ্বারা বস্তুর গঠন নির্দেশ করেন। বিজ্ঞানচর্চার জন্য এইসব সংকেত অপরিহার্য, কিন্তু এদের প্রকাশশক্তি অতি সংকীর্ণ। কোনও বস্তু যখন উপর থেকে নীচে পড়ে তখন তার বেগের ক্রমবৃদ্ধির হার বোঝাবার জন্য g অক্ষরটি চলে। কিন্তু এই অক্ষর দেখলে কোনও বস্তুর পতন আমাদের মনে প্রত্যক্ষবৎ অনুভূত হয় না। জলের সংকেত H_2O দেখলে তৃষ্ণাহারক পানীয় বা বৃষ্টিধারা বা মহাসাগর কিছুই মনে আসে না। সংগীতের জন্য স্বরলিপি উদ্ভাবিত হয়েছে। তা দেখে অভিজ্ঞ জন তাল-মান-লয়ের বিন্যাস বুঝতে পারেন, কিন্তু

তাতে গান বাজনা শোনার ফল হয় না। হয়তো খুব অভ্যাস করলে স্বরলিপি প'ড়েই সংগীতের স্বাদ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সম্ভবত এরকম অভ্যাসের প্রয়োজন কোনও কালে হবে না। সংগীত যতই কাম্য হ'ক তা এমন আবশ্যক নয় যে শ্রুতিগত সাক্ষাৎ উপলব্ধির অভাবে সংকেত-জনিত কল্পনার শরণ নিতে হবে।

সত্যমূলক বা কাল্পনিক কোনও ব্যাপার প্রতিরূপিত করবার যত উপায় আছে তার মধ্যে নাটকাভিনয় শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়, কারণ তা দেখাও যায় শোনাও যায়। তার পরেই মুখর চলচ্চিত্রের স্থান। শুনতে পাই এখন আর talkie যথেষ্ট নয়, smellie উদ্‌ভাবিত হচ্ছে, যাতে চিত্রার্পিত ঘটনার আনুষঙ্গিক গন্ধও পাওয়া যাবে। পরে হয়তো tastie আর touchieর আবিষ্কারে পঞ্চেন্দ্রিয়ের তর্পণ পূর্ণ হবে, ভোজের দৃশ্যে দর্শককে খাওয়ানো এবং দাঙ্গার দৃশ্যে কিঞ্চিৎ প্রহার দেওয়া হবে। কিন্তু অভিনয় বা সিনেমা কোনওটি সহজলভ্য নয়, বিশেষ বিশেষ বিদ্যার সংকেতও আমাদের কাছে প্রত্যক্ষতুল্য নয়। লিখিত সাহিত্যই একমাত্র উপায় যাতে জ্ঞান বা অনুভূতি সঞ্চারের জন্য কোনও আড়ম্বর দরকার হয় না, নূতন সংকেতও অভ্যাস করতে হয় না।

সাহিত্যের যা বিষয় তা এতই বিচিত্র আর জটিল যে তার প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পাওয়া অসম্ভব। কবিবর্ণিত নিসর্গদৃশ্য বা মানবচরিত্র, অথবা ভূগোলবর্ণিত বিভিন্ন দেশ-নদী-পর্বত-সাগরাদি, আমরা ইচ্ছা করলেই দেখতে পারি না। ঐতিহাসিক ঘটনা বা গ্রহনক্ষত্রের রহস্য আমাদের দৃষ্টিগম্য নয়। মৃত মহাপুরুষদের মুখের কথা শোনবার উপায় নেই। বিজ্ঞান বা দর্শনের সকল তত্ত্বের সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ অসম্ভব। অথচ অনেক বিদ্যা অল্পাধিক পরিমাণে

শিখতেই হবে, নতুবা মানুষ পঙ্গু হয়ে থাকবে। হিতোপদেশে আছে—

অনেকসংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকম্।
সর্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥

—অনেক সংশয়ের উচ্ছেদক, অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রদর্শক, সকলের লোচনস্বরূপ শাস্ত্র যার নেই সে অন্ধই। শাস্ত্র অর্থাৎ বিদ্যা শেখবার এই প্রবল প্রয়োজন থেকেই সংকেতময় লিখিত সাহিত্যের উৎপত্তি। যা সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা মনোগ্রাহ্য হ'তে পারে না তা সভ্য মানবের পূর্বপুরুষদের চেষ্টায় কৃত্রিম উপায়ে চিরস্থায়ী এবং সকলের অধিগম্য হয়েছে। একজন যা জানে তা সকলে জানুক — সাহিত্যের এই সংকল্প মুদ্রণের আবিষ্কারে পূর্ণতা পেয়েছে।

যে ভাষা অবলম্বন ক'রে সাহিত্য রচিত হয় সেই ভাষাও সংকেতের সমষ্টি। এই সংকেত শব্দাত্মক ও বাক্যাত্মক; কিন্তু বিজ্ঞানাদির পরিভাষার তুল্য স্থির নয়, প্রয়োজন অনুসারে শব্দের ও বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হয়। আমাদের আলংকারিকগণ শব্দের ত্রিবিধ শক্তির কথা বলেছেন—অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। প্রথমটি কেবল আভিধানিক অর্থ প্রকাশ করে, আর দুটি থেকে প্রকরণ অনুসারে গৌণ অর্থ পাওয়া যায়। শব্দের যেমন ত্রিশক্তি, বাক্যের তেমন উপমা রূপক প্রভৃতি বহুবিধ অলংকার। সাহিত্যের বিষয়ভেদে শব্দ ও বাক্যের অভিপ্রায় এবং প্রকাশশক্তি বদলায়। স্থূল বিষয়ের বর্ণনা বা বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের ভাষা অত্যন্ত সরল না হ'লে চলে না, তাতে শব্দের অভিধা বা বাচ্যার্থই আবশ্যক, লক্ষণা আর ব্যঞ্জনা বাধাস্বরূপ। উপমার কিছু প্রয়োজন হয়, কদাচিৎ একটু রূপকও চলতে পারে, কিন্তু উৎপ্রেক্ষা অতিশয়োক্তি

প্রভৃতি অন্যান্য অলংকার একবারেই অচল। ‘হিমালয় যেন পৃথিবীর মানদণ্ড’—এ ভাষা কাব্যের উপযুক্ত কিন্তু ভূগোলের নয়।

যন্ত্রাদি বা মানবদেহের গঠন বোঝাবার জন্য যে নকশা আঁকা হয় তা অত্যন্ত সরল, তার প্রত্যেক রেখার মাপ মূলানুযায়ী, তা দেখে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থান, আকৃতি আর আয়তন সহজেই মোটামুটি বোঝা যায়। যন্ত্রবিদ্যা শারীরবিদ্যা প্রভৃতি শেখবার জন্য নকশা অত্যাবশ্যক, কিন্তু তা শুধুই একসমতলাশ্রিত মানচিত্র বা diagram, তাতে মূলবস্তু প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয় না। তার জন্য এমন ছবি চাই যাতে অঙ্গের উচ্চতা নিম্নতা দূরত্ব নিকটত্ব প্রভৃতি পরিস্ফুট হয়। ছবিতে চিত্রকর পরিপ্রেক্ষিতের নিয়মে রেখা বিকৃত করেন, উচ্চাবচতা বা আলো-ছায়ার ভেদ প্রকাশের জন্য মসীলেপের তারতম্য করেন, ফলে মাপের হানি হয় কিন্তু বস্তুর রূপ ফুটে ওঠে। ঠিক অনুরূপ প্রয়োজনে লেখককে ভাষার সরল পদ্ধতি বর্জন করতে হয়। যেখানে বর্ণনার বিষয় মানবপ্রকৃতি বা হর্ষ বিষাদ অনুরাগ বিরাগ দয়া ভয় বিস্ময় কৌতুক প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় চিত্তবৃত্তি, সেখানে শুধু শব্দের বাচ্যার্থ আর নিরলংকার বৈজ্ঞানিক ভাষায় চলে না। নিপুণ রচয়িতা সে স্থলে ত্রিবিধ শব্দবৃত্তি এবং নানা অলংকার প্রয়োগে ভাষার যে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেন তাতে অতীন্দ্রিয় বিষয়ও পাঠকের বোধগম্য হয়।

অনেক আধুনিক লেখক নূতনতর সাংকেতিক ভাষায় কবিতা লিখছেন। এই বিদেশাগত রীতির সার্থকতা সম্বন্ধে বহু বিতর্ক চলছে, অধিকাংশ পাঠক এসব কবিতা বুঝতে পারেন না, অন্তত আমি পারি না। জনকতক নিশ্চয়ই বোঝেন এবং উপভোগ করেন, নয়তো ছাপা আর বিক্রয় হ'ত না। চিত্রে cubism আর sur-realism এর তুল্য

এই সংকেতময় কবিতা কি শুধুই মুষ্টিমেয় লেখকের প্রলাপ, না অনাস্বাদিতপূর্ব রসসাহিত্য? বোধ হয় মীমাংসার সময় এখনও আসে নি। নূতন পদ্ধতির লেখকরা বলেন — এককালে রবীন্দ্রকাব্যও সাধারণের অবোধ্য ছিল, অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত চিত্রকলাও উপহাস্য ছিল; ভাবী গুণগ্রাহীদের জন্য সবুর করতে আমরা রাজী আছি। হয়তো এঁদের কথা ঠিক, কারণ নূতন সংকেতে অভ্যস্ত হ'তে লোকের সময় লাগে। হয়তো এঁদের ভুল, কারণ সংকেতেরও সীমা আছে। নূতন কবিদের কেউ কেউ হয়তো সীমার মধ্যেই আছেন, কেউ বা সীমা লঙ্ঘন করেছেন। বিতর্ক ভাল, তার ফলে সদ্‌বস্তুর প্রতিষ্ঠা অথবা অসদ্‌বস্তুর উচ্ছেদ হ'তে পারে। যাঁরা বিতর্কে যোগ দিতে চান না তাঁদের পক্ষে এখন সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখাই উত্তম পন্থা।

বাংলা বানান

(১৩৫১)
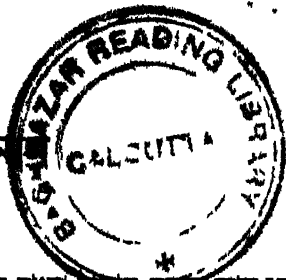
কয়েক মাস আগে বুদ্ধদেব বসু মহাশয় বাংলা বানান সম্বন্ধে আমাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধে তাঁর উত্থাপিত এবং আনুষঙ্গিক কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করছি।

সাত আট বৎসর পূর্বে যখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত বানান-সংস্কার-সমিতি তাঁদেব প্রস্তাব প্রকাশিত কবেন তখন শিক্ষিতজনের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য হয়েছিল। কেউ খুব বাগ দেখিয়েছিলেন, কেউ বলেছিলেন যে সমিতি যথেষ্ট সাহস দেখান নি — সংস্কার আরও বেশী হওয়া উচিত, আবার অনেকে মোটের উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সমিতিব উদ্দেশ্য ছিল — যেসব বানানের মধ্যে ঐক্য নেই সেগুলি যথাসম্ভব নির্ধারিত করা, এবং যদি বাধা না থাকে তবে স্থলবিশেষে প্রচলিত বানান সংস্কাব করা। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বানানে কেবল দুটি নিযম করা হয়েছে—রেফের পর দ্বিত্ববর্জন ('কর্ম, কার্য'), এবং ক-বর্গ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে বিকল্পে ং প্রয়োগ ('ভয়ংকর, সংগীত, সংঘ')। এই দুই বিধিই ব্যাকরণসম্মত। অসংস্কৃত (অর্থাৎ তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী) শব্দের জন্য কতকগুলি বিধি করা হয়েছে, কিন্তু অনেক বানানে হাত দেওয়া হয় নি, কারণ সমিতির মতে পরিবর্তন ক্রমে ক্রমে হওয়াই বিধেয়। যাঁরা বানান সম্বন্ধে উদাসীন নন তাঁদের অনুরোধ করছি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' (৩য় সংস্করণ) একখানা আনিয়ে প'ড়ে দেখবেন।

বানান-সমিতি কোনও বিষয়ে বিধান দেন নি বা বিশেষ কিছু বলেন নি, এই প্রবন্ধে তারই আলোচনা করছি।

সাধুভাষার বানানের অসাম্য খুব বেশী দেখা যায় না। বহু বৎসর পূর্বে এই ভাষা যে অল্প কয়েকজনের হাতে পরিণতি পেয়েছিল তাঁরা তখনকার শিক্ষিতসমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। বাংলা দেশের সব জেলার সাহিত্যসেবী তাঁদের অনুকরণ ক'রে চলতেন, সেজন্য সাধুভাষার বানান মোটের উপর সুনির্দিষ্ট হ'তে পেরেছে। চলিতভাষার প্রচলন যখন আরম্ভ হ'ল তখন এদেশে সাহিত্যচর্চা এবং লেখকদের আত্মনির্ভর বেড়ে গেছে। বহু লেখক চলিতভাষার প্রকাশশক্তি দেখে আকৃষ্ট হ'লেন, কিন্তু লেখার উৎসাহে তাঁরা নূতন পদ্ধতি আয়ত্ত করবার জন্য যত্ন নিলেন না, মনে করলেন — এ আর এমন কি শক্ত। এই ভাষায় ক্রিয়াপদ আর সর্বনাম ভিন্নপ্রকার, অন্য কতকগুলি শব্দেও কিছু প্রভেদ আছে, এবং এই সমস্ত শব্দের বানান পূর্বনির্ধারিত নয়। পাঠ্যপুস্তকেও চলিতভাষা শেখাবার বিশেষ ব্যবস্থা নেই। এই কারণে চলিতভাষায় বানানের অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা দেখা যায়।

চলিতভাষা এবং কলকাতা বা পশ্চিম বাংলার মৌখিক ভাষা সমান নয়, যদিও দুইএর মধ্যে কতকটা মিল আছে। লোকে লেখবার সময় যত সতর্ক হয় কথা বলবার সময় তত হয় না। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকেই দেখেছি যাঁর কথা আর লেখার ভাষা সমান। লেখার ভাষা, বিশেষত সাহিত্যের ভাষা, কোনও জেলার মধ্যে আবদ্ধ হ'লে চলে না, তার উদ্দেশ্য সকলের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান। এজন্য চলিত ভাষাকে সাধুভাষার তুল্যই নিরূপিত বা standardized হ'তে হবে। মুখের ভাষা যে অঞ্চলেরই হ'ক, মুখের ধ্বনি মাত্র, তা শুনে বুঝতে হয়। লেখার বা

সাহিত্যের ভাষা প'ড়ে বুঝতে হয়। মৌখিক ভাষার উচ্চারণই সর্বস্ব এবং তার প্রয়োগের ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। সাহিত্যের ভাষা সর্বজনীন, তার চেহারাটাই আসল, উচ্চারণ সকলের সমান না হ'লেও ক্ষতি হয় না। চলিতভাষা সাহিত্যের ভাষা, সুতরাং তার বানান অবহেলার বিষয় নয়।

অনেকে বলেন, উচ্চারণের অনুযায়ী বানান হওয়া উচিত। হ'লে ভাল হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু কার্যত তা অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব। কার উচ্চারণের বশে বানান হবে? জেলায় জেলায় প্রভেদ, অনেক শিক্ষিত পশ্চিমবঙ্গী 'মিচে কতা' (মিছে কথা) বলেন, অনেক পূর্ববঙ্গী 'তারাতারি' (তাড়াতাড়ি) বলেন, কিন্তু লেখবার সময় সকলেই প্রামাণিক বানান অনুসরণের চেষ্টা করেন। দৈবক্রমে কলকাতা বাংলা দেশের রাজধানী এবং বহু সাহিত্যিকের মিলনক্ষেত্র। এই কারণে কলকাতার মৌখিক ভাষা একটা মর্যাদা পেয়েছে এবং তার উপাদান ব্যক্তি- বা দল-বিশেষ থেকে আসে নি, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গড় (average) উচ্চারণ থেকেই এসেছে। যে অল্পসংখ্যক লেখকদের চেষ্টায় চলিতভাষার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, যেমন রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ইত্যাদি, তাঁদের প্রভাব অবশ্য কিছু বেশী। আদি লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রভাবও নগণ্য নয়। তা ছাড়া সাধু-ভাষার অসংখ্য শব্দ তাদের পূর্বনিরূপিত বানান সমেত এসেছে। চলিতভাষা একটা synthetic ভাষা এবং কতকটা কৃত্রিম। এই কারণে তার বানান সুনির্দিষ্ট হওয়া দরকার, কিন্তু উচ্চারণ পাঠকদের অভ্যাস এবং রুচির উপর ছেড়ে দিলে বিশেষ ক্ষতি হবে না।

সাধুভাষায় লেখা হয় 'করিতেছে, বসিবে', পড়া হয় 'কোরিতেছে, বোসিবে'। চলিতভাষায় অতিরিক্ত ও-কার, যুক্তাক্ষর এবং হস্‌চিহ্ন দিয়ে

'কোর্চ্ছে, বোস্‌বে' ইত্যাদি লেখবার কোনও দরকার দেখি না, 'করছে, বসবে' লিখলেই কাজ চলে। সুপ্রচলিত শব্দের বানানে অনর্থক অক্ষরবৃদ্ধি করলে জটিলতা বাড়ে, সুবিধা কিছুই হয় না। শিক্ষার্থীকে অন্যের মুখে শুনেই উচ্চারণ শিখতে হবে। অবশ্য নবাগত বিদেশী শব্দের বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত।

বাংলায় শব্দের শেষে যদি অযুক্তাক্ষর থাকে এবং তাতে স্বরচিহ্ন না থাকে, তবে সাধারণত হসন্তবৎ উচ্চারণ হয়। শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরেও প্রায় এইরকম হয়। আমরা লিখি 'চটকল, আমদানি, খোশমেজাজ', হস্‌চিহ্নের অভাবে উচ্চারণ আটকায় না। ব্যতিক্রম অবশ্য আছে, কিন্তু খুব বেশী নয়। উচ্চারণের এই সাধারণ রীতি অনুসারে অধিকাংশ শব্দে হস্‌চিহ্ন না দিলেও কিছুমাত্র বাধা হয় না। অনেকের লেখায় দেখা যায়—'কুচ্‌কাওয়াজ্‌, টি-পট, সুট্‌কেস্‌'। এইরকম হস্‌চিহ্নের বাহুল্যে লেখা আর ছাপা কণ্টকিত করায় কোনও লাভ নেই। যদি ভবিষ্যতে বাংলা অক্ষর সরল করবার জন্য যুক্তব্যঞ্জন তুলে দেওয়া হয়, তখন অবশ্য হস্‌চিহ্নের বহুপ্রয়োগ দরকার হবে।

আজকাল ও-কারের বাহুল্য দেখা যাচ্ছে। অনেকে সাধুভাষাতেও 'কোরিলো' লিখছেন। এতে বিদেশী পাঠকের কিছু সাহায্য হ'তে পারে, কিন্তু বাঙালীর জন্য এরকম বানান একবারে অনাবশ্যক। আমরা ছেলেবেলায় যে রকমে শিখি—বর্গীয় জএ ইঁও গ্‌গঁ, 'শীত' এর উচ্চারণ হসন্ত কিন্তু 'ভীত' অকারান্ত', 'অভিধেয়' আর 'অবিধেয়' শব্দের প্রথমটির অ ও-তুল্য কিন্তু দ্বিতীয়টির নয়, সেই রকমেই শিখব—'করিল' আর 'কপিল' এর বানান একজাতীয় হ'লেও উচ্চারণ আলাদা। যাঁরা পদ্যে অক্ষরসংখ্যা সমান রাখতে চান, তাঁদের 'আজো, আরো' প্রভৃতি

বানান দরকার হ'তে পারে, কিন্তু সাধারণ প্রয়োগে 'আজও, আরও' হবে না কেন? ও-কারের চিহ্ন লিখতে যে সময় আর জায়গা লাগে, আস্ত 'ও' লিখতে তার চেয়ে বেশী লাগে না। আমরা লিখি—'সেদিনও বেঁচে ছিল, ভূতপ্রেতও মানে না, অতও ভাল নয়, দুধও খায় তামাকও খায়'। 'ও' প্রত্যয় নয়, একটি অব্যয়শব্দ, মানে — অপি, অধিকন্তু, also, even। অব্যয় শব্দের নিজের রূপ নষ্ট করা অনুচিত। ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা নেই, আমরা 'তামা-কও' পড়ি না, 'তামাক্-ও' পড়ি; সেই রকম লিখব 'আজই, আজও', পড়ব 'আজ্-ই, আজ্-ও'। সর্বত্র সংগতিরক্ষা আবশ্যক।

'কারুর' শব্দটি আজকাল খুব দেখা যাচ্ছে। এটিকে slang মনে করি। সাধু 'কাহারও' থেকে চলিত 'কারও', কথার টানে তা 'কারু' হ'তে পারে। কিন্তু আবার একটা র যোগ হবে কেন?

য় অক্ষরটির দুরকম প্রয়োগ হয়। 'হয়, দয়া' প্রভৃতি শব্দে y-তুল্য আদিম উচ্চারণ বজায় আছে, কিন্তু 'হালুয়া, খাওয়া' প্রভৃতি শব্দে য় স্বরচিহ্নের বাহনমাত্র, তার নিজের উচ্চারণ নেই, আমরা বলি 'হালুআ, খাওআ'। 'খাওয়া, যাওয়া, ওয়ালা' প্রভৃতি সুপ্রচলিত শব্দের বর্তমান বানান আমাদের এতই অভ্যস্ত যে বদলাবার সম্ভাবনা দেখি না, যদিও যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি আ দিয়ে লেখেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও অনেক ক্ষেত্রে লিখতেন, এবং প্রাচীন বাংলা লেখাতেও য়া স্থানে আ চলত। কিন্তু নবাগত বিদেশী শব্দের বানান এখনও স্থিরতা পায় নি, সেজন্য সতর্ক হবার সময় আছে। Wavell, Boer, swan, drawer প্রভৃতি শব্দ বাংলায় 'ওআভেল, বোআর, সোআন, ড্রআর লিখলে য়-এর অপপ্রয়োগ হয় না। War এবং ware দুইএরই বানান 'ওয়ার' করা

অনুচিত, প্রথমটি 'ওঅর', দ্বিতীয়টি 'ওয়ার'। 'মেয়র, চেয়ার, সোয়েটার' লিখলে দোষ হয় না, কারণ য় য়া য়ে স্থানে অ আ এ লিখলেও উচ্চারণ প্রায় সমান থাকে।

'ভাইএর, বউএর, বোম্বাইএ' প্রভৃতিতে য়ে স্থানে এ লিখলে উচ্চারণ বদলায় না, কিন্তু লেখা আর বানান সহজ হয়, ব্যাকরণেও নিষেধ নেই। কেউ কেউ বলেন, দুটো স্বরবর্ণ পর পর উচ্চারণ করতে glide দরকার সে জন্য য় চাই। এ যুক্তি মানি না। 'অতএব' উচ্চারণ করতে তো বাধে না, য় না থাকলেও glide হয়।

সংস্কৃত শব্দে অনুস্বার অথবা অনুনাসিক বর্ণযুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে তজ্জাত বাংলা শব্দে প্রায় চন্দ্রবিন্দু আসে, যেমন 'হংস, পঙ্ক, পঞ্চ, কণ্টক, চন্দ্র, চম্পক' থেকে 'হাঁস, পাঁক, পাঁচ, কাঁটা, চাঁদ, চাঁপা'। কয়েকটি শব্দে অকারণে চন্দ্রবিন্দু হয়, যেমন 'পেচক, চোচ' থেকে 'পেঁচা, চোঁচ'। তা ছাড়া অনেক অজ্ঞাতমূল শব্দেও চন্দ্রবিন্দু আছে, যেমন 'কাঁচা, গোঁজা, ঝাঁটা'। পশ্চিমবঙ্গে চন্দ্রবিন্দুর বাহুল্য দেখা যায়। অনেকে 'একঘেঁয়ে, পায়ে ফোঁড়া, থান ইঁট' লেখেন, যদিও চন্দ্রবিন্দুহীন বানানই বেশী চলে। 'কাঁচ, হাঁসি, হাঁসপাতাল' অনেকে বলেন, কিন্তু লেখবার সময় প্রায় চন্দ্রবিন্দু দেন না। পূর্ববঙ্গী অনুনাসিক উচ্চারণে অভ্যস্ত নন, সেজন্য বানানের সময় মুশকিলে পড়েন, যথাস্থানে দেন না, আবার অস্থানে দিয়ে ফেলেন। সন্দেহ হ'লে অভিধান দেখে মীমাংসা হ'তে পারে কিন্তু যদি পূর্বসংস্কার দৃঢ় থাকে তবে সন্দেহই হবে না, ফলে বানানে ভুল হবে। আর এক বাধা—পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত লোকেও সকল ক্ষেত্রে একমত নন। যদি বিভিন্ন জেলার কয়েক জন বিদ্বান ব্যক্তি একত্র হয়ে চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ সম্বন্ধে একটা রফা করেন

এবং সংশয়জনক সমস্ত শব্দের বানান দিয়ে একটি তালিকা তৈরি করেন তবে তার বশে সহজেই বানান নিরূপিত হবে।

চন্দ্রবিন্দু সম্বন্ধে যা বলা হ'ল, ড় সম্বন্ধেও তা খাটে। পূর্ববঙ্গে ড় আর র প্রায় অভিন্ন, সেজন্য লেখার বিপর্যয় ঘটে। পশ্চিমবঙ্গেও অনেক শব্দে মতভেদ আছে। এক্ষেত্রেও তালিকার প্রয়োজন।

মোট কথা—অসংস্কৃত শব্দের বানান সাধারণত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত-জনের উচ্চারণের বশে করতে হবে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মীমাংসার প্রয়োজন আছে। অন্ধভাবে জনকতকের বানানকেই প্রামাণিক গণ্য করলে অন্যায় হবে। বানানে অতিরিক্ত অক্ষরযোগ অনর্থকর, তাতে জটিলতা আর বিশৃঙ্খলা বাড়ে। সর্বত্র উচ্চারণের নকল করবার দরকার নেই, পাঠক প্রকরণ (context) থেকেই উচ্চারণ বুঝবে। সাধুভাষার বানান আপনিই কালক্রমে অনেকটা সংযত হয়েছে, কিন্তু মৌখিকের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় চলিত ভাষায় সহজে তা হবে না — যদি না লেখকরা উদ্‌যোগী হয়ে সমবেত ভাবে চেষ্টা করেন।

বাংলা ছন্দের শ্রেণী

(১৩৫২)

'পরিচয়' এর শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার মহাশয় জানতে চেয়েছেন ছন্দ সম্বন্ধে আমার ধারণা কি। বিষয়টি বৃহৎ, ছন্দের সমগ্র তথ্য নিয়ে কখনও মাথা ঘামাই নি, সেজন্য সবিস্তার আলোচনা আমার সাধ্য নয়। বৎসরাধিক পূর্বে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে ছন্দের শ্রেণী সম্বন্ধে পত্রযোগে কিছু আলাপ হয়েছিল। তাঁকে আমার মতামত যা জানিয়েছিলাম তাই এই প্রবন্ধের ভিত্তি।

ছন্দের মূল উপাদান মাত্রা এবং তার বাহন syllable। সংস্কৃত 'অক্ষর' শব্দে syllable ও হরফ দুইই বোঝায়, তা ছাড়া ইংরেজী আর সংস্কৃতের syllable একই রীতিতে নিরূপিত হয় না। এই গোলযোগের জন্য syllable এর অন্য প্রতিশব্দ দরকার। প্রবোধবাবু 'ধ্বনি' চালিয়েছেন, কিন্তু এই সংজ্ঞাটিতে কিছু আপত্তি করবার আছে। Word যদি 'শব্দ' হয়, syllable যদি 'ধ্বনি' হয়, তবে sound বোঝাতে কি লিখব? ব্যাকরণে vowel sound, gutteral sound ইত্যাদির প্রতিশব্দ দরকার হয়। নূতন পরিভাষা স্থির করবার সময় যথাসম্ভব দ্ব্যর্থ পরিহার বাঞ্ছনীয়। বহুকাল পূর্বে কোনও প্রবন্ধে syllable এর প্রতিশব্দ 'শব্দাঙ্গ' দেখেছিলাম। এই সংজ্ঞায় দ্ব্যর্থের আশঙ্কা নেই, কিন্তু শ্রুতিকটু। সেজন্য এখন প্রবোধবাবুর 'ধ্বনি'ই মেনে নিচ্ছি। আশা করি পরে আরও ভাল সংজ্ঞা উদ্‌ভাবিত হবে।

ধ্বনি দুইপ্রকার, মুক্ত (open) ও বদ্ধ (closed)। মুক্তধ্বনির শেষে স্বরবর্ণ থাকে, তা টেনে দীর্ঘ করা যেতে পারে, যেমন তু। বদ্ধধ্বনির শেষে ব্যঞ্জন বর্ণ বা ং ঃ বা দ্বিস্বর (diphthong) থাকে, তা টানা যায় না, যেমন উৎ, সং, তঃ, কই, সৌ। সংস্কৃতে দীর্ঘস্বরযুক্ত ধ্বনি এবং বদ্ধধ্বনি গুরু বা দুই মাত্রা গণ্য হয় (ধী, উৎ), এবং হ্রস্বস্বরান্ত মুক্তধ্বনি লঘু বা এক মাত্রা গণ্য হয় (ধি, তু)। ইংরেজীতে সংস্কৃতের তুল্য সুনির্দিষ্ট দীর্ঘ স্বর নেই, কিন্তু বহু শব্দে স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণের জন্য গুরুধ্বনি হয় (fee)। বদ্ধধ্বনিতে যদি accent পড়ে তবেই গুরু, নতুবা লঘু। বাংলা ছন্দের যে সুপ্রচলিত তিন শ্রেণী আছে তাদের মাত্রানির্ণয় এক নিয়মে হয় না। ধ্বনির লঘুগুরুতার মূলে কোনও স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক কারণ নেই, তা প্রচল বা convention মাত্র, এবং ভাষাভেদে বিভিন্ন।

বাংলা ছন্দের শ্রেণীভাগ এই রকম করা যেতে পারে—
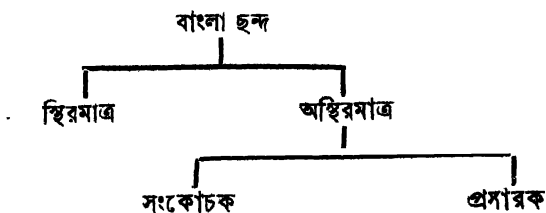
'স্থিরমাত্র'—যে ছন্দে ধ্বনির মাত্রা বদলায় না, যেমন বাংলা মাত্রাবৃত্ত। এতে মুক্তধ্বনি সর্বত্র লঘু, বদ্ধধ্বনি সর্বত্র গুরু। সংস্কৃতে দুই শ্রেণীর ছন্দ বেশী চলে, অক্ষরচ্ছন্দ (বা বৃত্ত) এবং মাত্রাচ্ছন্দ (বা জাতি)। এই দুই শ্রেণীই স্থিরমাত্র। সংস্কৃত মাত্রাচ্ছন্দের সঙ্গে বাংলা মাত্রাবৃত্তের সাদৃশ্য আছে; প্রভেদ এই, যে বাংলায় হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণভেদ নেই। ইংরেজী ছন্দকেও স্থিরমাত্র বলা যেতে পারে, কারণ তাতে accent

এর স্থান সাধারণত সুনির্দিষ্ট। সংস্কৃত অক্ষরচ্ছন্দের সঙ্গে ইংরেজী ছন্দের এইটুকু মিল আছে—ইন্দ্রবজ্রা মন্দাক্রান্তা প্রভৃতিতে যেমন লঘু গুরু ধ্বনির অনুক্রম সুনিয়ন্ত্রিত, ইংরেজী iambus, trochee প্রভৃতিতেও সেইরূপ।

'অস্থিরমাত্র'—যে ছন্দে ধ্বনির মাত্রা বদলাতে পারে। এর দুই শাখা—

'সংকোচক'—যে ছন্দে স্থানবিশেষে বদ্ধধ্বনির মাত্রাসংকোচ হয়, অর্থাৎ গুরু না হয়ে লঘু হয়, যেমন বাংলা অক্ষরবৃত্তে। মোটামুটি বলা যেতে পারে, এই শ্রেণীর ছন্দে মুক্তধ্বনি সর্বত্র লঘু, বদ্ধধ্বনি শব্দের অন্তে গুরু কিন্তু আদিতে ও মধ্যে সাধারণত লঘু। 'হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সংগীত'—এখানে—রাজ, -মার, -গীত গুরু কিন্তু নিস্-, তব-, অভ-, সং- লঘু। উক্ত নিয়মটি সম্পূর্ণ নয়, ব্যতিক্রম অনেক দেখা যায়। 'বীরবর, ভারতমাতা' প্রভৃতি সমাসবদ্ধ শব্দে এবং 'নজরুল, মুসলমান' প্রভৃতি অসংস্কৃত শব্দে আদ্য ও মধ্য বদ্ধধ্বনির সংকোচ হয় না, গুরুই থাকে। এই ব্যতিক্রমের কারণ — যুক্তাক্ষরের অভাব। সে সম্বন্ধে পরে বলছি।

'প্রসারক'—যে ছন্দে বদ্ধধ্বনি সর্বত্র গুরু, আবার স্থানবিশেষে মাত্রা প্রসারিত ক'রে মুক্তধ্বনিকেও গুরু করা হয়। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান' — এখানে মাত্রাবৃত্তের তুল্য সকল বদ্ধধ্বনিই গুরু, অধিকন্তু 'পড়ে' আর 'এল' র শেষ ধ্বনিকেও টেনে গুরু করা হয়েছে।

সংক্ষেপে—স্থিরমাত্র (মাত্রাবৃত্ত) ছন্দে মুক্তধ্বনি সর্বত্র লঘু, বদ্ধধ্বনি সর্বত্র গুরু। সংকোচক (অক্ষরবৃত্ত) ছন্দে মুক্তধ্বনি সর্বত্র লঘু, কিন্তু বদ্ধধ্বনি কোথাও গুরু কোথাও লঘু। প্রসারক (ছড়া-জাতীয়) ছন্দে মুক্তধ্বনি কোথাও লঘু কোথাও গুরু, এবং বদ্ধধ্বনি সর্বত্র গুরু।

এই ত্রিবিধ ছন্দঃশ্রেণীর মধ্যে মাত্রাবৃত্তের নিয়ম সর্বাপেক্ষা সরল, সেজন্য তার আর আলোচনা করব না। অন্য দুই শ্রেণী সম্বন্ধে কিছু বলছি।

'অক্ষরবৃত্ত' নামটি সুপ্রচলিত, শুনেছি প্রবোধবাবু এই নামের প্রবর্তক, কিন্তু সম্প্রতি তিনি অন্য নাম দিয়েছেন—'যৌগিক ছন্দ'। মাত্রাগত লক্ষণ অনুসারে একেই আমি 'সংকোচক ছন্দ' বলছি। 'অক্ষরবৃত্ত' নামের অর্থ বোধ হয় এই — এতে চরণের অক্ষর অর্থাৎ হরফের সংখ্যা প্রায় সুনিয়ত, যেমন পয়ারের প্রতি চরণে চোদ্দ অক্ষর, মাত্রাসমষ্টিও চোদ্দ। এই অক্ষরের হিসাবটি কৃত্রিম। ছন্দ কানের ব্যাপার, মাত্রাবৃত্ত ও ছড়ার ছন্দে পদ্যের লেখ্য রূপ অর্থাৎ বানান বা অক্ষরসংখ্যার উপর নজর রাখা হয় না, মাত্রাই একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু পদ্যকার যখন সংকোচক ছন্দ রচনা করেন তখন শ্রাব্য রূপ আর লেখ্য রূপকে পরস্পরের অনুবর্তী করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। শব্দ ও অর্থ সমান হলেও 'ঐ' এক অক্ষর, 'ওই' দুই অক্ষর, পদ্যকার সংখ্যার উপর দৃষ্টি রেখে 'ঐ' বা 'ওই' লেখেন। উচ্চারণ একজাতীয় হ'লেও স্থলবিশেষে শব্দের বানান অনুসারে মাত্রা বদলায় অথবা মাত্রার প্রয়োজনে বানান বদলায়। মাত্রাবৃত্তে 'শর্করা' আর 'হরকরা' দুইই চার মাত্রা, কিন্তু সংকোচক ছন্দে প্রথমটি তিন এবং দ্বিতীয়টি চার মাত্রা। 'সর্দার, বাগ্দেবী' তিন অক্ষর, কিন্তু মাত্রার প্রয়োজনে 'সরদার, বাগ্‌দেবী লিখে চার অক্ষর করা হয়। যাঁরা গদ্যে 'আজও, আমারই' লেখেন তাঁরাও পদ্যে 'আজো, আমারি' বানান করেন, পাছে অক্ষর বাড়ে। পদ্যকার ও পদ্যপাঠক দুজনেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যুক্তাক্ষরের উপর দৃষ্টি রেখে মাত্রানির্ণয় করেন। এরকম করবার প্রয়োজন আছে এমন নয়। যদি বানান না বদলে 'সরদার'কে স্থানভেদে চার মাত্রা বা তিনমাত্রা করবার রীতি থাকত তবে পাঠকের

বিশেষ বাধা হ'ত এমন মনে হয় না। কিন্তু যে কারণেই হ'ক রীতি অস্তবিধ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দ' পুস্তকে ১৪৩ পৃষ্ঠায় একটি উদাহরণে লিখেছেন—'দিগ্দিগন্তে প্রচারিছে অন্তহীন আনন্দের গীতা।' তিনি প্রচলিত রীতির বশেই অক্ষরসংখ্যা ঠিক রাখবার জন্য 'দিগ্দিগন্তে' লিখেছেন, মাত্রাবৃত্ত লিখলে সম্ভবত 'দিগ্ দিগন্তে' বানান করতেন।

অতএব কানের উপর নির্ভর ক'রে অক্ষরবৃত্তের সম্পূর্ণ নিয়ম রচনা করা চলে না, বানান অনুসারেও (অর্থাৎ যুক্তাক্ষর ং ঃ ইত্যাদির অবস্থান অনুসারেও) করতে হবে। সেকালের কবিরা অক্ষরসংখ্যার উপর বিশেষ নজর রাখতেন না—'সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে সর্বনাশ। নীচ শূদ্র দিয়া করে ধর্মের প্রকাশ॥' (চৈতন্যচরিতামৃত)। এরকম পদ্য এখন লিখলে doggerel গণ্য হবে। বোধ হয় ভারতচন্দ্রের আমল থেকে মাত্রাসংখ্যা আর অক্ষরসংখ্যার সাম্য সম্বন্ধে পদ্যকারগণ সতর্ক হয়েছেন। সম্ভবত তাঁরা সংস্কৃত অক্ষরচ্ছন্দের আদর্শে এই সাম্যরক্ষার চেষ্টা করেছেন। হয়তো আর এক কারণ — পাঠককে কিছু সাহায্য করা। ইংরেজী পদ্যেও syllable-সংখ্যা ঠিক রাখবার জন্য miss'd lack'd প্রভৃতি বানান চলে, যদিও কানে missed আর miss'd দুইই সমান।

যদি বাংলায় যুক্তাক্ষর উঠে যায় বা রোমান লিপি চলে, তা হ'লেও সম্ভবত বর্তমান রীতি অন্য উপায়ে বজায় রাখবার চেষ্টা হবে, 'সরদার' লেখা হবে sardar, কিন্তু মাত্রাসংকোচ বোঝাবার জন্য হয়তো 'সর্দার' স্থানে লেখা হবে sar'dar।

প্রবোধবাবু ছড়া-জাতীয় ছন্দের নাম দিয়েছিলেন 'স্বরবৃত্ত', এখন তিনি তাকে 'লৌকিক ছন্দ' বলেন। শেষের নামটি ভাল, তথাপি

মাত্রাগত লক্ষণ অনুসারে আমি এই শ্রেণীকে 'প্রসারক' বলতে চাই। প্রবোধবাবুর মতে 'এই ছন্দে সাধারণত প্রতি পঙ্‌ক্তিতে চার পর্ব (চতুর্থটি অপূর্ণ), প্রতি পর্বে চার ধ্বনি, এবং প্রথম ধ্বনিতে প্রস্বর (accent) থাকে।' শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁর ব্যাকরণে অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। উদাহরণ—'সাম্‌নেকে তুই ভয় করেছিস পেছন তোরে ঘিরবে'। আমি মনে করি, বাংলায় accent থাকলেও ছন্দের বন্ধনে তা অবান্তর, সাধারণত গুরুধ্বনি আর accent মিশে যায়। 'আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে' ইত্যাদি চরণে প্রথম ধ্বনি 'আ', পাঠকালে তাতে accent পড়ে না। 'কাশ'এ accent আছে বলা যেতে পারে, কিন্তু বস্তুত তা গুরুধ্বনি। 'প্রিয়নামটি শিখিয়ে দিত সাধের সারিকারে।...কালিদাস তো নামেই আছেন আমি আছি বেঁচে'—এই দুই চরণের প্রথম ধ্বনি (প্রি-, কা-) তে accent দেওয়া যায় না। প্রতি পর্বে সাধারণত চার ধ্বনি তা স্বীকার করি, কিন্তু ব্যতিক্রমও হয় ('শিখিয়ে দিত, তিন কন্যে')। এই রকম ছড়া-জাতীয় বা লৌকিক ছন্দের একটি লক্ষণ — শেষ পর্ব ছাড়া প্রতি পর্বে ছ মাত্রা, কিন্তু অন্য শ্রেণীর ছন্দেও ছ মাত্রা হ'তে পারে। অতএব এই ছন্দের বিশেষ লক্ষণ আর কিছু। এই লক্ষণ — মাত্রাপূরণের জন্য স্থানে স্থানে মুক্তধ্বনিকে টেনে গুরু করা। রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দ' পুস্তকে লিখেছেন—'তিন গণনায় যেখানে ফাঁক, পার্শ্ববর্তী স্বরবর্ণগুলি সহজেই ধ্বনি প্রসারিত ক'রে সেই পোড়ো জায়গা দখল ক'রে নিয়েছে'। 'বৃষ্টি পড়ে' ইত্যাদি ছড়ায় 'বৃষ্টি' তিন মাত্রা, শেষের এ-কার প্রসারিত করার ফলে 'পড়ে' ও তিন মাত্রা হয়েছে। এইরকম মাত্রাপ্রসার হয় ব'লেই এই শ্রেণীকে 'প্রসারক' বলতে চাই।

পদ্যকার বানানের উপর দৃষ্টি রেখে সংকোচক ছন্দ রচনা করেন, হয়তো তার এক কারণ পাঠককে সাহায্য করা—এ কথা পূর্বে বলেছি। প্রসারক শ্রেণীর লৌকিক ছন্দেও স্থানে স্থানে ধ্বনির মাত্রা বদলায়, কিন্তু চিহ্নাদির দ্বারা পাঠককে সাহায্য করবার চেষ্টা হয় নি। এর কারণ—সেকালে এই ছন্দ পণ্ডিত জনের অস্পৃশ্য ছিল, লিখে রাখাও হ'ত না, লোকে অতি সহজে মুখে মুখেই শিখত।

রবীন্দ্রপরিবেশ

(১৩৫৫)

আমাদের জীবনযাত্রায় নানারকম বস্তু দরকার হয়, কিন্তু শুধু দরকার বুঝেই আমরা তাদের মর্যাদা দিই না। যেসব বস্তু আমরা অত্যন্ত আবশ্যক মনে করি তাদের উদ্‌ভাবক বা নির্মাতা মহাপ্রতিভাশালী হ'লেও আমাদের কাছে নিতান্ত পরোক্ষ, তাঁরা একবারেই আড়ালে থাকেন, ভোগের সময় আমরা তাঁদের কথা ভাবি না। রেলগাড়ি না হ'লে আমাদের চলে না, কিন্তু গাড়িতে চ'ড়ে তার প্রবর্তক স্টিভেনসনকে কজন স্মরণ করে? কালক্রমে বহু যন্ত্রী রেলগাড়ির বহু পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু এমন আপত্তি শোনা যায় নি যে তাতে স্টিভেনসনের মর্যাদাহানি হয়েছে। পক্ষান্তরে যে বস্তু স্থূল সাংসারিক ব্যাপারে অনাবশ্যক, কিন্তু আনন্দ দেয় বা রসোৎপাদন করে, তার রচয়িতা রচনার সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকেন, ভোগের সঙ্গে সঙ্গে আমরা রচয়িতাকেও স্মরণ করি, রচনা থেকে রচয়িতার তিলমাত্র বিচ্ছেদ সইতে পারি না। যন্ত্রের অদলবদল নির্বিবাদে হ'তে পারে, কারণ যন্ত্রের সঙ্গে আমাদের কেবল স্থূল স্বার্থের সম্বন্ধ। কিন্তু কবি বা চিত্রকরের রচনার সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সম্বন্ধ, তাই এমন স্পর্ধা কারও নেই যে তাঁদের উপর কলম চালান।

রসসৃষ্টি ও রসস্রষ্টার এই যে অঙ্গাঙ্গিভাব, এরও ইতরবিশেষ আছে। রচয়িতার পরিচয় আমরা যত বেশী জানি ততই রচনার সঙ্গে তাঁর নিবিড়

সম্বন্ধ উপলব্ধি করি। যাঁরা বেদ বাইবেল রচনা করেছেন তাঁরা অতিদূরস্থ নক্ষত্রতুল্য অস্পষ্ট, তাঁদের পরিচয় শুধুই বিভিন্ন ঋষি আর প্রফেটের নাম। বেদ বাইবেল অপৌরুষেয়, কারণ রচয়িতারা অজ্ঞাতপ্রায়। বাল্মীকি কালিদাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কিংবদন্তী আছে ব'লেই পাঠকালে আমরা তাঁদের স্মরণ করি। শেকস্পীয়ার সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাই সম্বল ক'রে পাঠক তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, যদিও তিনিই তন্নামে খ্যাত নাটকাদির লেখক কিনা সে বিতর্ক এখনও থামে নি। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি সম্বন্ধে লোকের যতটুকু জ্ঞান ছিল সম্প্রতি তাঁর নোটবুক আবিষ্কৃত হওয়ায় তা অনেক বেড়ে গেছে, এখন তাঁর অঙ্কিত চিত্রের সঙ্গে তাঁর অজ্ঞাতপূর্ব বহুমুখী প্রতিভার ইতিহাস জড়িত হয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বকে স্পষ্টতর করেছে।

রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আমরা যত এবং যে ভাবে জানি, আর কোনও রচয়িতার পরিচয় কোনও দেশের লোক তেমন ক'রে জানে কিনা সন্দেহ। আমাদের এই পরিচয় কেবল তাঁর সাহিত্যে সংগীতে চিত্রে ও শিক্ষায়তনে আবদ্ধ নয়, তাঁর আকৃতি প্রকৃতি ধর্ম কর্ম অনুরাগ বিরাগ সমস্তই আমরা জানি এবং ভবিষ্যদ্‌বংশীয়রাও জানবে। এই সর্বাঙ্গীণ সপ্রেম পরিচয়ের ফলে তাঁর রচনা আর ব্যক্তিত্বের যে সংশ্লেষ ঘটেছে তা জগতে দুর্লভ।

ইওরোপ আমেরিকায় এমন লেখক অনেক আছেন যাঁদের গ্রন্থবিক্রয়সংখ্যার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তাঁদের রচনা যে মাত্রায় জনপ্রিয় তাঁরা স্বয়ং সে মাত্রায় জনহৃদয়ে প্রতিষ্ঠা পান নি। বাইরনের অগনতি ভক্ত ছিল, তাঁর বেশভূষার অনুকরণও খুব হ'ত, কিন্তু তাঁর ভাগ্যে প্রীতিলাভ হয় নি। বার্নার্ড শ বই লিখে প্রচুর অর্থ ও অসাধারণ খ্যাতি

হয়েছেন। তিনি অশেষ কৌতূহলের পাত্র হয়েছেন, লোকে তাঁর নামে সত্য মিথ্যা গল্প বানিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছে; কিন্তু তিনি জনবল্লভ হ'তে পারেন নি।

এদেশে একাধিক ধর্মনেতা ও গণনেতা যশ ও প্রীতি এক সঙ্গেই অর্জন করেছেন, যেমন চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু নেতা না হয়েও যে লোকচিত্তে দেবতার আসন পাওয়া যায় তা রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্ভব হয়েছে। কেবল রচনার প্রতিভা বা কর্মসাধনার দ্বারা এই ব্যাপার সংঘটিত হয় নি, লোকোত্তর প্রতিভার সঙ্গে মহানুভাবতা ও কান্তগুণ মিলে তাঁকে দেশবাসীর হৃদয়াসনে বসিয়েছে। এদেশে তিনি যা পেয়েছেন তা শুষ্ক সম্মান নয়, যথার্থ ই পূজা।

গুরু বললে আমরা সাধারণত যা বুঝি—অর্থাৎ মন্ত্রদীক্ষাদাতা—তার জন্য যে বাহ্য ও আন্তর লক্ষণ আবশ্যক তা সমস্তই তাঁর প্রভূত মাত্রায় ছিল। কিন্তু যিনি লিখেছেন—'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি' যোগাসন, সে নহে আমার'—তাঁর পক্ষে সামান্য গুরু হওয়া অসম্ভব। যে অগুহ্য মন্ত্র তিনি দেশবাসীকে দিয়ে গেছেন তার সাধনা যোগাসনে জপ করলে হয় না, ভক্তিতে বিহ্বল হ'লেও হয় না। তার জন্য যে জ্ঞান নিষ্ঠা ও কর্ম আবশ্যক তা তিনি নিজের আচরণে দেখিয়ে গেছেন। তাই তিনি অগণিত ভক্তের প্রশস্ত অর্থে গুরুদেব। তাঁর লোকচিত্তজয়ের ইতিহাস অলিখিত, কিন্তু অজ্ঞাত নয়। কৃতী গুণীকে তিনি উৎসাহদানে কৃতিতর করেছেন, ভীরু নির্বাক অনুরাগীকে সাদরে ডেকে এনে অভয়দানে মুখর করেছেন, ভক্ত প্রাকৃত জনকে বোধগম্য সরস আলাপে কৃতার্থ করেছেন। মূঢ় অসূয়ক তাঁর সৌজন্যে পদানত হয়েছে, ক্রূর নিন্দক তাঁর নীরব উপেক্ষায় অবলুপ্ত হয়েছে।

বুদ্ধ চৈতন্যাদিতে কালক্রমে দেবত্বারোপ হয়েছে। কালিদাস শুধু কবি, তথাপি নিস্তার পান নি, কিংবদন্তী তাঁকে বাগ্‌দেবীর সাক্ষাৎ বরপুত্র বানিয়েছে। রবীন্দ্রচরিতের এরকম পরিণাম হবে এমন আশঙ্কা করি না। সর্ববিধ অতিকথার বিরুদ্ধে তিনি যা লিখে গেছেন তাই তাঁকে অমানবতা থেকে রক্ষা করবে।

রবীন্দ্ররচনা অতি বিশাল, রবীন্দ্রবিষয়ে যে সাহিত্য লিখিত হয়েছে তাও অল্প নয়, কালক্রমে তা আরও বাড়বে। কবির সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছে তাঁদের অনেকে আরও চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর বাঁচবেন এবং তাঁদের দ্বারা রবীন্দ্রতত্ত্ব বিবর্ধিত হবে। তা ছাড়া কবির বহু সহস্র পত্র, অসংখ্য প্রতিকৃতি, স্বরচিত অনেক চিত্র বিকীর্ণ হয়ে আছে, তাঁর গানে দেশ প্লাবিত হয়েছে, তাঁর কণ্ঠস্বরও যন্ত্রগত হয়ে স্থায়িত্ব পেয়েছে। এই সমস্তের সমবায়ে এবং তাঁর স্বরচিত ভারতীক্ষেত্রে যে বিপুল রবীন্দ্রপরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে রবীন্দ্রাত্মার নিবিড় সংযোগ অক্ষয় ক'রে রাখবে। তিনি মহা অজানার প্রস্থান করলেও আমাদের কাছে চিরকাল জীবিতবৎ প্রত্যক্ষ থাকবেন। এমন অমরত্বলাভ অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটেছে।